মাসিক
مجلة جاغو مجاهد الشهرية الاسلامية

জাগো মুজাহিদ

THE MONTHLY JAGO MUJAHID

এপ্রিল ২০০০

রক্তে রাঙ্গা চেচনিয়া

ইতিহাসের চলমান ট্রাজেডী বনাম বন্ধকী বিবেক

চেচনিয়া

গ্রোজনী



লাহোর থেকে কান্দাহার

মাসিক জাগো মুজাহিদ -এর নিয়মাবলী

এজেন্সী

- সর্বনিম্ন দশ কপির এজেন্সী দেয়া হয়
- এজেন্সীর জন্য অগ্রীম বা জামানত পাঠাতে হয় না
- অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয়
- যে কোন মাস থেকে এজেন্সী দেয়া হয়
- যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়
- অবিক্রিত কপি ফেরৎ নেয়া হয় না
- ২৫% কমিশন দেয়া হয়

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

- বাংলাদেশ ॥ * রেজিষ্ট্রি ডাক-দুইশত টাকা * সাধারণ ডাক-একশত পঁয়তাল্লিশ টাকা
- ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ॥ দশ ডলার
- মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া ॥ ষোল ডলার
- ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ॥ বিশ ডলার

গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম

বিদেশ থেকে গ্রাহক হবার জন্য ব্যাংক ড্রাফট 'মাসিক জাগো মুজাহিদ' নামে পাঠাতে হয়।
দেশের অভ্যন্তর থেকে মানিঅর্ডার পাঠাতে হবে নিম্নের যোগাযোগের ঠিকানায়-

বিজ্ঞাপনের হার

চতুর্থ কভার (পূর্ণ পৃষ্ঠা)	৮০০০/-
দ্বিতীয় ও তৃতীয় কভার (পূর্ণ পৃষ্ঠা)	৬০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা	৩০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা	১৫০০/-
ভিতরের এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	১০০০/-

একাউন্ট

মাসিক জাগো মুজাহিদ
চলতি হিসাব নং ৫৩১৯
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
লোকাল ব্রাঞ্চ
মতিঝিল, ঢাকা।

পত্র যোগাযোগের ঠিকানা
মাসিক জাগো মুজাহিদ
বি-৩৮১, খিলগাঁও, তালতলা, ঢাকা-১২১৯

মাসিক
مجلة جاغو مجاهد الشهرية الاسلامية
জাগো মুজাহিদ
THE MONTHLY **JAGO MUJAHID**

এপ্রিল– ২০০০ইং

সম্পাদক
মুফতী আব্দুল হাই

দাম ঃ ১২ (বার) টাকা মাত্র

যোগাযোগ
মাসিক জাগো মুজাহিদ
বি-৩৮১, খিলগাঁও, তালতলা
ঢাকা-১২১৯

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সূচীপত্র

পাঠকের কলাম

জাগো মুজাহিদকে যারা বন্ধ করে দিতে চায় তাদেরকে তাওবা করতে বলছি

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমার সালাম ও আন্তরিক ভালবাসা নিবেন। মাসিক জাগো মুজাহিদ পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-খাদেমগণকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি একজন নগণ্য মানুষ। আমীরে শরীয়ত হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রাহঃ)-এর মুরীদ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত আন্দোলনের সদস্য।

আমার মুরব্বী ঢাকা বড় কাটারা মাদ্রাসার সাবেক মুহাদ্দেছ, বর্তমানে কুলিয়ার চর নূরুল উলূম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীছ আল্লামা আব্দুল আলী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর নির্দেশ মত মাসিক জাগো মুজাহিদ পড়ে দেখি সত্যিই এ এক বিরাট নেয়ামত। জাতীয় পর্যায়ে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় এ পত্রিকা ব্যাপক অবদান রাখবে ইনশাআল্লাহ্।

এর প্রতিটি নিবন্ধ সম্পূর্ণ কোরআন-হাদীছের আলোকে প্রকাশিত হচ্ছে। আর এই নেয়ামতে শুকরিয়া আদায় না করে যারা বিরুদ্ধাচরণ করত পৃষ্ঠপোষকগণকে আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে পেরেশান করছে; আমি তাদের মঙ্গলের জন্য পরামর্শ দিতে চাই যে, তারা যেন অনতিবিলম্বে তাওবা করে এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তাদের নিকট ক্ষমা চেয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে খুশী করে। তারা যেন এই অপরাধের জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে আখেরাতের পথ সুগম করেন। কেননা, আল্লাহ্ প্রদত্ত কোরআন ও হাদীছের প্রচারণায় যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তারা এ থেকে তওবা না করলে পরকালে যে কী কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হবে, তা যেন কোন ভাল আলেমের নিকট থেকে জেনে নেন। একজন মুসলমান হিসাবে অন্য ভাইকে সতর্ক করা একান্ত জরুরী বিধায় বলছি, আর কোনদিন এমন জ্বলন্ত আগুনে হাত দিবেন না।

পরিশেষে পত্রিকাখানার দীর্ঘায়ু কামনা করে এর সকল কর্মকর্তা, খাদেমগণের জন্য দোয়া করি, যেন আল্লাহ্ পাক তাদের জানে-মালে হেফাযত করেন। দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও সাফল্য দান করেন। আল্লাহ্ পাক এই পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রিয় নবী (সঃ)-এর সাথে জান্নাতে রাখেন। হে পরওয়ারদেগার! আপনি মাসিক জাগো মুজাহিদ পত্রিকাখানাকে কবুল করে নিন।

আমার বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বলছি, শরীয়ত মতে যে কোন মূল্যে এই পত্রিকার জন্য আমি জান-মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি ইন্‌শাআল্লাহ্। আল্লাহর রাস্তায় আমার শহীদি মওত হোক এই আমার কামনা। আল্লাহ্ পাকের রেজামন্দিই আমার আসল মক্‌ছুদ। আল্লাহ্ পাক সবাইকে হেদায়েত নছিব করুন। সমগ্র পৃথিবীতে খেলাফত সরকার পদ্ধতি কয়েম হোক। আমার এই ক্ষুদ্র লেখা পরকালের নাজাতের অছিলা হোক। আমীন।

মাসউদুল হক মাসুদ
(প্রাক্তন সৈনিক, মুক্তিযোদ্ধা, খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদস্য)
কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।

কোথায় লুকিয়ে ছিলে তুমি?

কেন একটি বছর লুকিয়ে ছিলে তুমি? কেন কাঁদালে আমাকে, লক্ষ পাঠককে? তুমি কি ফাঁদে আটকা পড়েছিলে? তুমি কি কালা-কানুনের অক্টোপাশে , বন্দী হয়েছিলে? তা হবে কি করে, তুমি যে প্রহরী, তুমি তো জাগাও। তুমি তো প্রতিক্ষণ এই বলে ডাক দিয়ে যাও, জাগো মুজাহিদ! তোমার অবর্তমানে কে শুনাবে আমাদের জাগানিয়ার গান? তোমার অবর্তমানে কেউ একটিবারও উচ্চারণ করেনি, জাগো নওজোয়ান! জাগো মুজাহিদ! সবাই শুনায় ঘুম পাড়ানিয়া গান। তোমার অবর্তমানে মনে হয়েছে এ জনপদ এক বিশাল কবরস্থান। তোমার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে, এ জনপদের মানুষ এখনো বেঁচে আছে, যারা মেরুদণ্ড সোজা করে বাতিলের মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তোমার আহ্বানে যখন ঘুমের পাড়া জেগে উঠছে, তখন তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। আল্লাহ্‌র সাহায্য সম্বল করে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবই ইনশাআল্লাহ্। আর লুকাবে না কিন্তু। হে আমার প্রিয় জাগো মুজাহিদ!

– হেলাল উদ্দীন,
চাঁদপুর।

শাহাদাত আমাদের কাম্য

জাগো মুজাহিদের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট, আশা করি তাঁরা সকলে ভাল আছেন। আপনারা ভাল থাকলেই আমাদের মত গাঁও-গেরামের অজ্ঞ-তরুণরা ইসলামের মূলনীতি, আদর্শ ও শিক্ষা সঠিকভাবে জানতে পারি। পাশাপাশি মুসলমানদের দুর্দিনে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমাদের তুচ্ছ প্রাণ উৎসর্গ করে শাহাদাতের বিশাল মর্যাদার মুকুট পড়ার সৌভাগ্য লাভ হবে বলেও আশাবাদী। আপনারা শুনলে হয়তো খুশী হবেন, আমরা গুটিকয়েক তরুণ মিলে 'জাগো তরুণ' নামে একটি ইসলামী সমিতি গঠন করেছি। এই সমিতির আওতায় একটি ইসলামী পাঠাগার রয়েছে। এই পাঠাগারের মাধ্যমে বিভিন্ন জিহাদী বই-পুস্তক হালুয়াঘাটের মুসলমান ভাইদের হৃদয়ে ধীরে ধীরে শাহাদাত লাভের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করছে। তাছাড়া এই সমিতির মাধ্যমে আপনাদের প্রকাশিত মসিক "জাগো মুজাহিদ" হালুয়াঘাটে বিতরণ করা হচ্ছে। এই ম্যাগাজিন বিক্রি করে মুনাফা অর্জিত হচ্ছে- তার পুরোটাই সমিতির তহবিলে জমা হচ্ছে। এই ম্যাগাজিনের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। প্রতি মাসে অন্তত ১০ কপি করে এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমিতির পাঠাগারের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়াজ নসিহতের অডিও ক্যাসেট বিতরণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র রহমতে আমাদের এই ইসলামী প্রচারণায় মুসলমান ভাইদের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। দোয়া ও পরামর্শ আমাদের এই নতুন প্রতিষ্ঠানটির জন্য একান্ত অপরিহার্য।

মুহাম্মদ আজীজুল হক
হালুয়াঘাট, মোমেনশাহী।

জাগো মুজাহিদের প্রতি জাতির আস্থা অপরিসীম

দেশবরেণ্য আলিমগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এবং স্বনামধন্য লেখকগণের সুচিন্তিত লেখা দ্বারা সুশোভিত "জাগো মুজাহিদ" যে সময়ের চাহিদা পূরণে সক্ষম, সে কথা আবার প্রমাণিত হল।

এ পত্রিকাটি ইসলামী সংস্কৃতি ও আদর্শ বিকাশে এক নতুন দিগন্ত। ইসলামের নীতি-বর্জিত আদর্শচ্যুত ক্ষমতাবানদের ইচ্ছার উপর এ পত্রিকার ভবিষ্যৎ সোপদ করা যাবে না। এ পত্রিকার যাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে এদের মোকাবেলা করেই।

'সত্য সর্বকালের মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত' এ সত্য ও সরল কথাটি ওরা বুঝেও মানছে না। কেননা ওরা জ্ঞানপাপী। আর জ্ঞানপাপীরা হল ড্রাগনের চেয়েও মারাত্মক জীব।

ইসলামী সংবিধান বাস্তবায়নে যে "জাগো মুজাহিদ" আত্মনিয়োগ করেছে, তার বিরুদ্ধে ষযড়ন্ত্র করে কেউ পত্রিকাটি বন্ধ রাখবে তা তৌহিদী জনতা মেনে নিবে না, নিতে পারে না। সত্য ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠায় জাগো মুজাহিদের যাত্রা। মানবতার উৎকর্ষ সাধনে, মানবতার মান উন্নয়নে স্বীয় কর্তব্য পালন করে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা তার অঙ্গীকার এং অসত্যকে প্রতিরোধ করতে সে সর্বক্ষণ সচেষ্ট। এ পত্রিকার প্রতি জাতির আস্থা অপরিসীম। আমরা এর স্থায়ীত্ব কামনা করি।

ফুজাইল আহ্‌মাদ

নেত্রকোনা।

প্রেরণার আঁধার

অনেক দিন পর আবার ভেঙ্গে যাওয়া মনটায় চাঙ্গাভাব অনুভব করছি। নিজেকে উজ্জীবিত মনে হয়েছে এক নতুন শক্তিতে। এর কারণ জাগো মুজাহিদ। অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি, ইসলাম বিরোধী বিদেশী দালালরা মুসলিমের উপর অন্যায় ও অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি করছে। তাদেরকে বাধা দেয়ার জন্য মাথা তুললে সে মাথাটিকে কিভাবে দ্বিখণ্ড করবে, সে চিন্তায় তারা দিন-রাত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তবুও মুসলিম মুজাহিদ জনতা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে অন্যায়ের বিরোধিতা করে চলেছে। তারা বাতিলের মোকাবেলায় নিজের জানমাল নিয়ে জিহাদ করে যাচ্ছে। কিন্তু কাফির-মুশরিকরা ইসলামকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতে চাচ্ছে। এ লক্ষ্যে তারা নতুন ফাঁদ তৈরি করছে। মাসিক জাগো মুজাহিদ-এর নাম-নিশানা কিভাবে বাংলার যমীন থেকে মুছে ফেলা যায়, সেই চেষ্টা ছিল ওদের অনবরত। কিন্তু তারা ব্যর্থ হলো। দীর্ঘ প্রায় এক বছর বন্ধ থাকার পর ইসলামের দাওয়াতপত্রখানি আবার ফিরে এসেছে পাঠকের হাতে। মুসলিম জাহান পেরেশান ছিল এই জন্য তারা এক অজানা আশংকায় ভুগছিলেন, বুঝি জাগো মুজাহিদ আর ফিরে আসবে না পাঠকের হাতে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার অপার কুদরতে তিনি আবার এই যমীনে তার পুনর্জীবন দান করেছেন। ইনশাআল্লাহ্ জাগো মুজাহিদ এই যমীনে কায়েম থাকবে। আমাদের সকলের এই প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে।

মুহাঃ মেহেদী হাছান ইবনে মাহফুজ

রামপুর, লক্ষ্মীপুর।

ইসলামী জাতিসংঘ চাই

'আল কুফ্‌রু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ।' মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র মুখনিসৃত এই হাদীছের সরল অর্থ– 'ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে সকল কুফ্‌রী শক্তি জোটবদ্ধ।' এই একবিংশ শতকের মোহনায় এসে আমরা এই বাস্তবতাই প্রত্যক্ষ করছি সর্বত্র।

আমরা জাতিসংঘের দ্বিমুখী নীতির কথা বলতে পারি। পূর্ব তিমুরে স্বাধীনতাকামীরা স্বাধীনতা পেয়ে গেল খৃষ্টান হওয়ার সুবাদে। অথচ দীর্ঘ অর্ধ শতক ধরে আযাদীপাগল কাশ্মীরী মুসলমানদের রক্ত নিয়ে তামাশা খেলে চলেছে আধিপত্যবাদী ভারত। জাতিসংঘ থেকেছে নীরব সমর্থক হয়ে।

মুসলমানদেরকে জন্য সে যদি কখনো কিছু করে, তবে অবশ্যই তা এই জন্য–যাতে মুসলিম দেশগুলো তার বিকল্প কিছু ভাবতে সুযোগ এবং ফুরসত না পায়।

কার্যত এটি একটি 'ইসলাম ও মুসলমান নিধন সংঘে'র ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে নিরলসভাবে। ইহুদী-খৃষ্টান-হিন্দুদের হয়ে এমনসব 'কাজ' সে সমাধা করে দিচ্ছে, যেটা সরাসরি তাদের দ্বারা সম্ভব নয়।

উপরের কথাগুলো একপেশে আর চটুল মনে হলেও, এগুলো খুবই সত্য।

আমরা কি এই 'নিধন সংঘ' থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিছু ভাবছি?

ও.আই.সি নামে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা থাকলেও, তার অবদান যথেষ্ট নয়।

মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণ সম্মিলিতভাবে যদি কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তবে এই 'আন্তর্জাতিক আগ্রাসন' থেকে বিশ্ব মুসলিম মুক্তি পেতে পারে। নিশ্চিত হতে পারে বিশ্বের মানব সম্প্রদায়ের শান্তি ও সংহতি।

সাদীকুল্লাহ মিসবাহ

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

হ্যাপি মিলেনিয়াম ধন্যবাদ টিএসসি

৩১ ডিসেম্বর রাত। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড তার বুকের স্পর্শকাতর জায়গা টিএসসি খুলে দিল মিলেনিয়াম বরনের কাতুকুতু খেলার জন্য। বিরাট খেলা। দর্শকও প্রচুর। খেলুড়ে নায়ক পঙ্গপাল নিয়ে হাজির রাত ১২টার পূর্বেই। সহকারী নায়করাও চোখে স্বপ্ন আঁকে বাহুবন্ধ অচেনা নায়িকার নরম শরীরের খায়েশি নড়াচড়া। গড়িয়ে যায় সময় সেকেন্ড মিনিট করে করে। মহানায়ক প্রস্তুত। প্রস্তুত তার বাহিনী। দু'একটা মশা গ্যাঞ্জাম করে। মাঝে মাঝে মহানায়কের আব্বারা মোবাইলে খবর নেয়। কী বাবা, খেলা শুরু হল? বিস্ফারিত নয়নে নায়ক জবাব দেয়, না বাবা, নায়িকা এখনও আসেনি। মধ্যরাতের অন্ধকারে ধাক্কা মেরে একটি গাড়ীর হর্ন বেজে ওঠে। দরজা খুলে যায়। নেমে আসে ভূবন মোহিনী মক্ষিরানী। পৌষের শীত হার মেনেছে। যৌবনের প্রচণ্ড তাপে গরম কাপড় না পরে পরেছে স্কার্ট। কোমর খুজু খুজু করে দ্রুত পায়ে আসছে নায়িকা। উদ্বিগ্ন দর্শক। খুশি খুশি টিএসসি। নায়ক গজেন্দ গমনে হাই হাই হ্যাল্লো হ্যাল্লো করে এগিয়ে যায়। নবাগত মিলেনিয়াম নায়কের ঘন ঘন নিশ্বাসে বুঝে নেয় তার নিয়ত খারাপ। ভদ্র বাবার সন্তান নায়ক নায়িকাকে পেয়ে তার ফোজদারি হাত দুটোকে চালু করে। পাতলা বসনা ষোড়শী নায়িকা আরাম আরাম বোধ করে। চোখ বন্ধ হয়ে আসে, শরীর অবশ হয়। এই তো চেয়েছি। এজন্যই তো শীতের রাতে হালকা

জামা পরে এসেছি। রেফারির বাঁশি না বাজতেই শুরু হল বস্ত্র ছেঁড়া কাতুকুতু খেলা। সহকারীরাও ফাও চান্স নিতে এগিয়ে এল। শুরু হল ফাইনাল কাতুকুতু খেলা। সাবাস নায়ক! সাবাস সহকারীরা! আরে! দীর্ঘদিনের ট্রেনিং কি আর বৃথা যায়? নায়িকা বেচারী কিন্তু এত বেশী লোকের সাথে জীবনেও কাতুকুতু খেলেনি। তাই তো বাংলা ভুলে ইংরেজীতে হেল্প হেল্প করতে থাকে। উলঙ্গ শরীরের সর্বত্র ডজন দুয়েক খেলুড়ের কাতুকুতু সহ্য করতে না পেরে নায়িকা অচেতন হয়ে পড়ে। রেফারি পুলিশের বাঁশি শোনা যায়। খেলা শেষ হওয়ার সিগন্যাল। টিএসসি এ রকম একটি ঐতিহাসিক খেলা দেখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে। নায়কের বাজানরা খেলার খবর শুনে খুশি হয় শুধু দুঃখ পায় মিলেনিয়াম, লজ্জায় মুখ ঢাকে সমগ্র জাতি।

মিথুন কামাল

বিংশ শতাব্দী, একুশ শতক হবে কেন?

আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি, গোটা পৃথিবীর মানুষের নতুন শতাব্দীর আয়োজন ও বিংশ শতাব্দী শেষ কথাটি বলার জন্য আমি ভেবে অবাক হই যে, গোটা পৃথিবীর একটি মানুষও কি সঠিক হিসাব জানে না। তা বলছ, নতুন শতাব্দী। আমি তা বলত বা মানতে রাজি নই। কারণ, কাউকে যদি ১০০ পযৃন্ত গণনা করতে বলা হয় তাহলে তিনি ১০০ পর্যন্তই গণনা করবেন, ৯৯ পর্যন্ত গগণনা করবে না। যদি কেউ ৯৯ পর্যন্ত গণনা করেন, তাহলে তার হিসাব ভুল হবে। আরও সুন্দরভাবে বলা যায়, ধরুন আপনার কাছে এক ব্যক্তি ১০০ টাকা পাওনাদার আপন যদি তাক ৯৯ টাকা দেন, তাহলে সেই ব্যক্তি আপনার কাছ আরও ১ টাকা পাওনা থাকবেন। আর এই হিসাব মতে বিংশ শতাব্দী পূরণ হত এখনও ১টি বছর বাকি আছে। আর বিংশ শতাব্দী তখনই পূর্ন হবে যখন ২-এর পিঠে তিনটি শূন্য বসবে। আর নতুন শতাব্দী তখনই শুরু হবে যখন বিংশ শতাব্দী পূর্ণ হয়ে ২০০১ সাল চালু হবে। আর এই হিসাব মতে আমরা প্রকৃতির কাছে ১টি বছর পাওয়া আছি। অতএব গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে আমার প্রশ্ন, এই হিসাব মতে কি করে বিংশ শতাব্দী একুশ শতক হয়।

মোঃ আব্দুল হাই
ঠনঠনিয়া, বগুড়া।

মুক্তার মালা

জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ আবু আলী সিনা বলেন --

সকল পুণ্যের খনি হচ্ছে দশটি আচরণ--

(১) সত্যের নিষ্ঠা, (২) সকলের সাথে সুবিচার, (৩) প্রবৃত্তির প্রতি রূঢ়তা, (৪) আলেমের সাহচর্য, (৫) জ্ঞানীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, (৬) ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা, (৭) বন্ধুদের সাথে বিশ্বস্ত থাকা, (৮) শত্রুর ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা, (৯) সংসার ত্যাগী ফকীর-দরবেশের সাথে উদার ব্যবহার করা, (১০) জাহেলদেরকে জ্ঞান দান।

-- যে ব্যক্তি সব সময় প্রতিশোধ গ্রহণ করার চিন্তায় থাকে, তার ক্ষত কখনও শুকায় না।

-- আবু আলী সিনা

-- ইবনে সুহাইম (রাহঃ) বর্ণনা করেন, আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) তখন মুসলিম জগতের খলীফা, একদা তখন একদিন তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে দেখি, তাঁর গলায় দড়ি বাঁধা এবং একটি শিশু সেটি ধরে রয়েছে। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছি দেখে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) বল্লেন, কি করব ভাই! আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যাদের ঘরে শিশু আছে, তাদের উচিত কখনও কখনও নিজেরাও শিশুর মত হয়ে ওদের সাথে খেলায় অংশগ্রহণ করা।

-- তারীখুল খোলাফা

স্মরণ রেখো! ইসলাম যে সম্মান দান করেছে, তাতে তৃপ্ত না হয়ে যদি অন্য আরও কোনখান থেকে সম্মান অর্জন করতে চেষ্টা কর, তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন।

-- হযরত ওমর (রাঃ)

শাসকরা যখন বিগড়ে যায়, তখন জনগণও বিগড়াতে শুরু করে। সর্বাপেক্ষা ইতর সেই বক্তি, যার প্রভাবে তার অধীনদের মধ্যে অনাচার বিস্তার লাভ করে।

-- হযরত ওমর (রাঃ)

এমন এক সময় আসবে, যখন শাসক সম্প্রদায় শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়কারীর ভূমিকা পালন করেই কর্তব্য সমাধা করবে। এমতাবস্থায় লজ্জা, বিশ্বাস এবং দায়িত্ববোধ দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাবে।

-- হযরত ওসমান (রাঃ)

যে ব্যক্তি কোরআন বুঝতে পেরেছে, তার হাতে সকল জ্ঞানের চাবি এসে গেছে।

-- হযরত আলী (রাঃ)

অশ্লীল কথা যে বলে আর যে তা মানুষের সামনে প্রচার করে, উভয়েই সমান অপরাধী।

-- হযরত আলী (রাঃ)

যে এরূপ আকাংখা পোষণ করে যে, ঈমানের সাথে যেন তার মৃত্যু হয়, তার উচিত অন্যের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা।

-- ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ)

একজন রাখাল যখন সতর্কতাসূচক ধমক দেয়, তখন তার প্রত্তগুলি সতর্ক হয়ে যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, আল্লাহর কিতাব বার বার আমাদেরকে সতর্ক করে, কিন্তু আমরা সতর্ক হই না।

-- সুফিয়ান সওরী (রাহঃ)

সৎকর্ম অন্তরে আলো এবং আমলের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করে। অনাচার অন্তরে অন্ধকার এবং আমলে দুর্বলতা সৃষ্টি করে।

-- সুলাইমান তাইমী (রাহঃ)

প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পদ অর্জন করার নাম দুনিয়ার প্রতি মহব্বত নয়।

-- সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রাহঃ)

যে ব্যক্তি শাক-পাতা খেয়েই তৃপ্ত হতে পারে, তাকে কেউ গোলাম বানাতে পারে না।

-- মাসআদ বিন কোদাম (রাহঃ)

অন্যের নিকট হাত পাতার বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাওয়ার মত কিছু সম্পদ সঞ্চয় করে রাখলে তাতে দরবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

-- আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রাহঃ)

প্রকৃত খোদাভীরুদেরকে তিনটি বিষয় দান করা হয়। মেজাজে স্নিগ্ধতা, চেহারায় অপার্থিব ঔজ্জ্বল্য এবং প্রখর ব্যক্তিত্ব।

-- ইউসুফ ইবনে আসবাত (রাহঃ)

আহমাদ আল-ফিরোজী

সম্পাদকীয়

জিহাদের পথেই বিশ্ব নেতৃত্ব মুসলমানের হাতে আসবে এবং অচিরেই!

বিশ্বব্যাপী ইসলামী জাগরণের এক নম্বর শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিনীদের সাথে আছে ইসরাইল। নতুন করে দল পাকাচ্ছে ভারত। অর্থাৎ-পৃথিবীর সক্ষম প্রতিটি শক্তিই এখন ঐক্যবদ্ধ। খোদাদ্রোহী, নাস্তিক, ইহুদী, নাসারা, হিন্দু, বৌদ্ধ ; বলতে গেলে গোটা বিধর্মী বিশ্বই এখন এক। ঐক্য তাদের ইসলামকে দাবিয়ে রাখার ইস্যুতে। কেননা, বর্তমান শোষণ ও অত্যাচারের ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেলে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার মত যোগ্য কোন শুভশক্তি এখন আর নেই। একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই ভরসা। সুতরাং যে কোন মূল্যে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রুখতেই হবে।

বর্তমান বিশ্বের কথিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুপার পাওয়ার (তাদের দাবি অনুযায়ী। ইসলামের দৃষ্টিতে কাফেররা কোন পাওয়ারই নয়। কেননা, হাদীস শরীফে আছে, যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস বা আল্লাহ্‌র স্মরণ নেই, তারা মৃত) আমেরিকা নিজের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখার পথে একমাত্র হুমকি মনে করে ইসলামী জিহাদী শক্তিকে। আর এর বর্তমান কেন্দ্রীয় অঞ্চল হচ্ছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল এলাকায় গড়ে ওঠা অসংখ্য জিহাদী সংগঠন, মধ্য এশিয়ার মুজাহিদ তৎপরতা, পূর্ব-ইউরোপের জিহাদী শক্তি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জিহাদী কার্যক্রম এবং বাংলাদেশের জিহাদী জনতাও এখন ইঙ্গ-মার্কিন, ইহুদী-নাসারা শক্তির জন্য চক্ষুশূল। জিহাদী জাগরণে ভীত-সন্ত্রস্ত কথিত আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার ভারতও এ জিহাদী শক্তিকে যমের মত ভয় করে। জাগ্রত ইসলামী জিহাদী কাফেলার অগ্রযাত্রাকে রোখার জন্যে তাই মার্কিনীরা পূর্ব-পশ্চিমের সকল ছোট-বড় শক্তির সাথে হাত মিলাচ্ছে। শত্রুকে বন্ধু বানাচ্ছে। স্বার্থ বিনিময় করছে।

কিন্তু এসব করেও কি তাদের শেষ রক্ষা হবে? হবে না। কারণ, ইসলাম তার অভ্যুদয়ের পর থেকেই বিজয়ী শাসক ও নিয়ন্ত্রক শক্তি। মধ্যে পশ্চিমা অপশক্তির হাতে নয় বরং তাদের তৈরি স্বজাতীয় গাদ্দারদের চক্রান্তে ইসলাম কিছুটা ঝড়ের মুখে পড়লেও পুনরায় সে তার নিজ শক্তিতে দাঁড়াচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্‌ আগামী ৫০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর মূল চালিকা ও নিয়ন্তা শক্তি হবে ইসলাম।

অন্যায়, অত্যাচার, অপকর্ম, অশ্লীলতা, অমানবিকতা, অধর্ম ও অপসংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব নেতৃত্ব আর বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংসের মুখোমুখি। প্রয়োজন একটি জিহাদী জাগরণ। একটি মুজাহিদের আযান। ইনশাআল্লাহ্‌, এই প্রতিরোধ সংগ্রাম ও জিহাদী অভিযাত্রা এখন পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। ভয়ে কাঁপছে কথিত পরাশক্তির কর্তাব্যক্তিরা। মুজাহিদের ছায়াটি দেখলেও তারা কাপড়ে পেশাব করে দেয়। একজন পাগড়িধারী মুজাহিদ স্বপ্নে দেখলেও তারা চীৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। নারায়ে তাকবীরের ক্যাসেটকৃত আওয়াজ শুনলেও তাদের হার্ট-এটাক হয়। এই তো তাদের পরাশক্তির নমুনা।

নতুন শতাব্দী ইসলামের। আগামী দিনের বিশ্বব্যবস্থা ইসলাম। ইসলামের পতাকা ওয়াশিংটন শুধু নয়, পৃথিবীর প্রতিটি কেন্দ্রীয় রাজধানীতে উড়বে। কিন্তু এ জন্যে দুর্বল ঈমান, আপোষকামী আদর্শ ও তরল চরিত্রের মুসলিম নেতৃত্ব যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট নয় হীনমন্য, সংগ্রামবিমুখ ইসলামী নেতৃত্ব। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন শাহাদাতের নেশায় বিভোর সর্বত্যাগী জিহাদী সংগঠন। প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী জাগরণবাদী বিশ্ব মুসলিম ছাত্র-যুবশক্তির উত্থান। এ রকম জাগ্রত মুজাহিদদের বেশি সংখ্যা বা বিপুল শক্তির প্রয়োজন হয় না; সত্যিকার মুজাহিদ এক দু'জন হলেই বাতিল, খোদাদ্রোহী ও অত্যাচারী শক্তি ভয়ে থর থর কাঁপে। ইদানীংকার কিছু ঘটনায় কথিত পরাশক্তিগুলোর ভয় ও শংকার পরিমাণ অবশ্যই দুনিয়াবাসী দেখতে পাচ্ছে।

আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সাঃ)-এর ভাষায় "মুসলিম জাতির মান-মর্যাদা ও স্বাধীনতার একমাত্র পথ হলো জিহাদ"। "ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর চূড়াও হচ্ছে জিহাদ"। অতএব, জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানের জীবন, সম্পদ, সম্মান, দ্বীন ও ঈমান নিরাপদ হতে পারে না। বিশ্ব নেতৃত্ব মুসলমানের হাতেও আসতে পারে না। দুনিয়ার মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের জন্যে তো ইসলাম অপরিহার্য। আর ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্যে অনিবার্য হল তার শক্তিশালী উপস্থিতি। অতএব, বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের জেগে ওঠা যে কত জরুরী, তা কি আর বলে বুঝানোর দরকার আছে?

কালামে এলাহী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সমগ্র পৃথিবী যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথা নত করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পথে লড়াই করতে থাক

৩০। আর তাদের সঙ্গে তোমরা লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা নির্মূল হয় এবং সামগ্রিকভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অবশেষে যদি তারা ফিরে আসে, তো আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ড দেখছেন।

৩১। কিন্তু যদি তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সহায়ক। আয়াত ঃ ৩৯, ৪০

জিহাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ফেতনা নির্মূল হওয়া। অর্থাৎ কাফিরদের শক্তি এমনভাবে খর্ব করা, যেন তারা মানুষকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং সত্য-সঠিক ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের উচ্চবাচ্য করার সাহস না থাকে। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে, যখন-ই পৃথিবীর যে ভূখণ্ডে কাফিররা ক্ষমতা লাভ করেছে, তখনই মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। স্পেনের দৃষ্টান্ত তো বিশ্ববাসীর সামনেই রয়েছে।

আর জিহাদ ও কিতালের প্রাথমিক লক্ষ্য হল, যাতে ইসলামের অনুসারীরা নিরাপদে-নিশ্চিন্তে আল্লাহর দাসত্ব করতে পারে এবং তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু কাফিরদের হাত থেকে নিরাপদ থাকে। ফেতনার এই ব্যাখ্যা হযরত ইবনে উমর প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে।

অপরদিকে জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল কুফর নির্মূল হয়ে যাওয়া, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং আল্লাহর সত্য দ্বীন আর সব মতবাদের উপর বিজয়ী হওয়া। এই বিজয়ী হওয়াটা অন্যসব মিথ্যা মতবাদের উপস্থিতিতেও হতে পারে। যেমনটি হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে। কিংবা হতে পারে অন্যসব বাতিল মতবাদকে নিশ্চিহ্ন করে। যেমনটি ঘটবে হযরত ঈসা (আঃ) এর অবতরণের পর।

সারকথা, আলোচ্য আয়াতে প্রমাণ করে যে, যুদ্ধ—চাই আক্রমণাত্মক হোক কিংবা প্রতিরক্ষামূলক- মুসলমানদের বেলায় তা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন না আলোচ্য দু'টি লক্ষ্য অর্জিত হবে।

গনীমতের সম্পদ বন্টনে আল্লাহর বিধান

৩২। তোমরা আরো জেনে রাখ যে, যুদ্ধে (কাফিরদের থেকে) তোমরা যা কিছু লাভ কর, তার পাঁচ ভাগের একভাগ আল্লাহ, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, এতীমদের, দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদের, যদি তোমরা ঈমান রাখ, আল্লাহর প্রতি ও সেই বস্তুর প্রতি, যা মীমাংসার দিন— দু'টি দল মুখোমুখি হওয়ার দিন আমি আমার বান্দার (মুহাম্মদ (সাঃ)-এর) প্রতি অবতারণ করেছিলাম। আর আল্লাহ তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। আয়াত ঃ ৪১

যুদ্ধের মাধ্যমে কাফিরদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা সম্পদ কিংবা কাফিরদের পালাবার সময় ফেলে যাওয়া বস্তু মুজাহিদরা বন্টন করে ভোগ করবে। এই সম্পদের পাঁচ ভাগের একভাগ আল্লাহর নিজের। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সম্পদ পাঁচটি খাতে ব্যয় করতে পারেন। ১) নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ২) নিজের সেই স্বজনদের মাঝে, যারা যাকাত খেতে পারেন না ৩) এতীমদের মাঝে ৪) অভাবী মুসলমানদের মাঝে এবং ৫) মুসাফিরদের মাঝে। গনীমতের অবশিষ্ট চার অংশ বন্টিত হবে যোদ্ধাদের মাঝে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ওফাতের পর এখন গনীমতের আল্লাহর পঞ্চমাংশের পাওনাদারদের শেষ তিন শ্রেণী বাকী আছে। কাজেই বর্তমান যুগে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বন্টন হবে এতীম, গরীব ও মুসাফিরদের মাঝে।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তাআলার সাহায্যের ধরন

৩৩। স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে (মদীনার দিকে) এবং তারা (কাফিরা) ছিল দূর প্রান্তে আর (আবু সুফিয়ানের) কাফেলা ছিল তোমাদের থেকে এড়িয়ে নিম্নভূমিতে। যদি তোমরা (ও মুশরিকরা) পরস্পর অঙ্গীকার নিতে, তবে অঙ্গীকার পূরণে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিত। কিন্তু যা ঘটার ছিল, আল্লাহ তা ঘটাবেন-ই, যাতে যাদের জন্য ধ্বংস অবধারিত, প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা ধ্বংস হবে আর যাদের জীবিত থাকার কথা, প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা জীবিত থাকে। আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩৪। স্মরণ করুন, আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় কম। যদি তিনি আপনাকে এমন দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অনেক, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং কাজে প... পর বিরোধ করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে ভীরুতা ও বিবাদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন। আল্লাহ মানুষের মনের খবর সম্পর্কে সম্যক অবগত।

৩৫। আরো স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিলে, তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের চোখে স্বল্প সংখ্যক এবং তাদের চোখে তোমাদেরকে অধিক-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন, যা সংঘটিত হওয়ার ছিল তা ঘটাবার জন্য। আর সব কিছু তো আল্লাহর সমীপেই প্রত্যাবর্তিত হয়। আয়াত ৪২, ৪৩, ৪৪

হে মুজাহিদগণ! তোমরা দৃঢ়পদে লড়াই কর এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ কর

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর মুখোমুখী হবে, তখন দৃঢ়পদ থাকবে এবং বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফল হতে পার। আয়াত ঃ ৪৫

হে মুজাহিদগণ! অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে তোমরা বিরত থাক; অন্যথায় সাহসহারা ও দুর্বল হয়ে পড়বে

৩৭। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর আর পরস্পর বিবাদ কর না। অন্যথায় তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্যধারণ কর; আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

৩৮। তোমরা সেই লোকদের ন্যায় হয়ো না, যারা দম্ভভরে ও লোক দেখাবার জন্য আপন ঘর থেকে বের হয়েছিল। তারা লোকদের নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ থেকে। আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আয়াত ঃ ৪৬, ৪৭

এ দু'টি আয়াতে এবং এর আগের একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদেরকে ছয়টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) অবিচল থাকা (২) অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা (৩) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা (৪) বিবাদ থেকে বিরত থাকা; চাই তা জিহাদের আমীরের সঙ্গে হোক বা পরস্পর হোক (৫) ধৈর্য ধারণ করা এবং (৬) দম্ভভরে লোকদেরকে নিজেদের শক্তি ও শান দেখাবার জন্য বের না হওয়া।

শয়তান তার বন্ধুদের ধোঁকা দিয়েছে

৩৯। স্মরণ কর, শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে শোভন করে দিল এবং বলতে শুরু করল, আজ কোন মানুষই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না; আর আমি তোমাদের পার্শ্বেই আছি। কিন্তু পরে যখন দু'টি দল

পরস্পর মুখোমুখি হল, তখন সে পিছন দিকে কেটে পড়ল এবং বলল, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছ না। আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। আর আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর। আয়াত ঃ ৪৮

এটিও বদর যুদ্ধের ঘটনা। যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিকে শয়তান এক আরব নেতার রূপ ধরে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু পরে যখন আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতরণ করতে শুরু করেন, তখন সে পালিয়ে যায়। (পরবর্তী তিন আয়াতেও বদর যুদ্ধের কাহিনী বিবৃত হয়েছে)

৪০। স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা বলতে শুরু করল যে, এদের (মুসলমানদের) দ্বীন এদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে। (অর্থাৎ সংখ্যায় এত নগন্য এবং নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের অস্ত্রসজ্জিত শক্তিশালী বিপুলসংখ্যক সৈন্যের মোকাবেলায় এগিয়ে আসা প্রমাণ করে যে, এরা ধোঁকায় পড়েছে। জবাবে আল্লাহ্ বলছেন, এটি ধোঁকা নয়–তাওয়াক্কুল) বস্তুত যে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে, সে নিশ্চিন্ত। কেননা, আল্লাহ্ অতি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪১। তুমি যদি দেখতে পেতে, যখন ফেরেশতা কাফিরদের জান কবজ করে ; প্রহার করে তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে এবং বলে, ভোগ কর জাহান্নামের শাস্তি।

৪২। এ হল সেই কর্মের পরিণতি, যা তোমাদের হাত পূর্বে প্রেরণ করেছে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। আয়াত ঃ ৪৯, ৫০ ৫১

৪৩। এদের (মক্কার মুশরিকদের) অবস্থা ফেরআউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদের ন্যায়। তারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে ; ফলে আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেন। আল্লাহ্ শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা।

৪৪। তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ কখনো পরিবর্তন করেন না সেসব নেয়ামত, যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছেন, যতক্ষণ না তারা পাল্টে দেয় নিজেদের নীতি-আদর্শ। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

৪৫। ফেরআউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় এরাও এদের রব এর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আর ডুবিয়ে মেরেছি ফেরাআউনের বংশধরদের। তারা সকলে-ই ছিল জালিম। আয়াত ঃ ৫২, ৫৩, ৫৪।

৪৬। আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারা, যারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না।

৪৭। তাদের মধ্য থেকে তুমি যাদের সঙ্গে চুক্তি করেছ, তারা প্রতিবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং পরে সাবধান হয় না।

৪৮। কাজেই যুদ্ধে যখনি তুমি তাদেরকে আয়ত্তে পাবে, পিছনের লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুমি তাদেরকে এমন শাস্তি দেবে, যাতে তারা শিক্ষা পায়।

৪৮। যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর, তবে তোমার চুক্তিও তুমি তাদের দিকে ছুড়ে ফেলে দাও এমনভাবে, যেন তোমরা ও তারা সমান হয়ে যাও। বিশ্বাস ভঙ্গকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। আয়াত ঃ ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮

আয়াতের অর্থ হল, যেসব কাফির তাদের কুফরীর উপর অটল এবং বারংবার চুক্তি ভঙ্গ করে, তারা আল্লাহ্র সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব। যুদ্ধে যখনই এদের নাগালে পাওয়া যাবে, এমন শাস্তি দিতে হবে, যেন বংশ পরম্পরায় সে কথা মনে থাকে। প্রিয়নবী (সাঃ) যেমনটি করেছিলেন বনু কুরায়জার সঙ্গে। আর যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসভঙ্গের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি বাতিল করে দেয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু বিষয়টি আগেই তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে, যাতে তোমরা এবং তারা আপন আপন নিরাপত্তায় সমানভাবে সজাগ হতে পার। এমন যেন না হয় যে, হঠাৎ বাহিনী নিয়ে গিয়ে চুক্তিভঙ্গের ঘোষণা দিলে। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারী ও প্রতারককে ভালবাসেন না। তবে যদি কাফিররা এমনটি মনে করে যে, তোমাদের এই নীতি অনুযায়ী কাজ করায় তারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করার সুযোগ পাবে, তো এটি তাদের ভুল ধারণা। (পরবর্তী আয়াতটিতে একথাটি বিবৃত হয়েছে)

৫০। কাফিররা যেন কখনো মনে না করে যে, তারা রক্ষা পেয়ে গেছে। (আল্লাহকে) তারা কখনো শক্তিহীন করতে পারবে না। আয়াত ঃ ৫৯

মুসলমানগণ! তোমরা জিহাদের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কর

৫১। আর কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তোমরা যত পার শক্তি ও অশ্ববাহিনীর প্রস্তুতি নাও, যা দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্র শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে। এছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা চেন না, চেনেন আল্লাহ্। আর আল্লাহ্র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। আয়াত ঃ ৬০

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার ন্যায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়াও ফরজ এবং আবশ্যক পরিমাণ যুদ্ধের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে রাখাও ফরজ।

আলোচ্য আয়াতে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক যুগে যুগের উপযোগী যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে

৫২। আর যদি তারা সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে তুমিও তার প্রতি আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৫৩। যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে, তো তোমার জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। তিনি-ই তোমাকে তাঁর সাহায্য এবং মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।

৫৪। আর তিনি-ই তাদের (মুমিনদের) পরস্পরের হৃদয়ের মাঝে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর সব সম্পদ ব্যয় করেও তুমি তাদের মাঝে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মাঝে প্রীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৫৫। হে নবী! তোমার জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট এবং মুমিনদের যারা তোমার অনুসারী হয়েছে, তাদের জন্যও। আয়াত ঃ ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

কাফিররা যদি তোমার কাছে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে, তাহলে সরলমনে তুমি তাদের প্রস্তাব মেনে নাও। অতঃপর যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় প্রতারণা করা, তাহলে তাদের সঙ্গে বুঝা-পড়া করার জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। আগেও আমি তোমাকে সব রকম সাহায্য করেছি এবং তোমার সহযোগিতার জন্য মুমিনদের প্রস্তুত করেছি। এক কালে যারা ছিল একে অপরের খুনের পিয়াসী, আমার-ই অনুগ্রহে এখন তারা-ই পরিণত হয়েছে তোমার নবুওতের মশালধারী হিসেবে।

ইবনে হাতেম

হাদীসে রাসূল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জিহাদের বরকতে দু'জন-ই জান্নাতে

হাদীস

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা দু' ব্যক্তিকে নিয়ে হাসেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করেছিল এবং পরে দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ করে। প্রথমজন (জান্নাতে প্রবেশ করবে) এ কারণে যে, সে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। পরে আল্লাহ্ হত্যাকারীর তাওবা কবুল করে নেন এবং সেও জিহাদে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়ে যায়। (বুখারী, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৬)

ব্যাখ্যা

জমউল ফাওয়ায়েদ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬-এ এ ধরনের একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এক কাফির ও এক মুসলমানের মধ্যে প্রাথমিক মোকাবেলা শুরু হয়। কাফির লোকটি মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে। তার পর অপর এক মুসলমান মোকাবেলার জন্য এগিয়ে আসে। কাফির তাকেও হত্যা করে ফেলে। এবার কাফির লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নিকট এসে দাঁড়িয়ে যায় এবং জিজ্ঞেস করে যে, 'আপনি কি উদ্দেশ্যে লড়াই করছেন?' জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'আমাদের ধর্মে আছে যে, আমরা মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে থাকব, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল এবং আমরা আল্লাহ্র সমুদয় হক আদায় করব।' একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে কাফির মুসলমানদের দলে গিয়ে যোগ দিয়ে কাফিরদের উপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যায়। মৃত্যুর পর তাকে তুলে নিয়ে সেই দু' মুসলমানের সঙ্গে রাখা হয়–যাদেরকে এইমাত্র সে হত্যা করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মন্তব্য করলেন, 'এ লোকটি জান্নাতী'।

আলোচ্য হাদীসে এই যে বলা হল, 'আল্লাহ্ তা'আলা হাসেন'; তার দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রহমত বর্ষণ। কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের হাস্য করার অর্থ পুরস্কার প্রদান করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এমন দু' ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান করেন।

এ হাদীস থেকেও জিহাদের আজমত ও শাহাদাতের ফজীলত জানা যায়। এও প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ করার জন্য শুধু মু'মিন হওয়াই যথেষ্ট। জিহাদের জন্য বিশেষ স্তরের ঈমান বা বিশেষ আমলের প্রয়োজন নেই। যেমন আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল যে, ঐ লোকটি ক্ষণিক আগে মুসলমান হত্যা করছিল এবং এইমাত্র মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেল ও দরবারে নবুওত থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে গেল।

আসল কথা হল, মুসলমান যদি একবার সাহস করে এই বরকতময় আমলের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে, তাহলে তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে সমুদ্র বয়ে যেতে শুরু করে। কিন্তু সমস্যা হল, মানুষের জঘন্যতম দুশমন নফস মানুষকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হতে দেয় না এবং নানা রকম বাহানা সাজাতে থাকে। তার কারণ, জিহাদে নফস এর মৃত্যু ঘটে এবং শয়তান অপদস্ত হয়। তাই নফস ও শয়তান আপ্রাণ চেষ্টা করে, মানুষকে কিভাবে জিহাদ থেকে বিরত রাখা যায়। কিন্তু যে ভাগ্যবান মুসলমান সাহস করে এই মহান আমলের ময়দানে একবার পা রাখে, আল্লাহ্ তার জন্য রহমতের সব দরজা উন্মুক্ত করে দেন। হোক সে যাচ্ছে তাই। তবে জিহাদ দ্বারা তার উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন।

মুজাহিদের রোযা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে (জিহাদ করা অবস্থায়) রোযা রাখল, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নাম থেকে তাকে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন। (বুখারী, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৮)

আল্লামা ইবনে জাওযী (রহঃ) বলেন فى سبيل الله (আল্লাহ্র পথে) যখন সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় জিহাদ। ঈমাম বোখারীর মতে কুরআন-হাদীসে - فى سبيل الله দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদ।

(তাফহীমুল বুখারী, খণ্ড ঃ ২, পৃষ্ঠা ঃ ৮০)

ব্যাখ্যা

মুজাহিদের সম্মানে আল্লাহ্ পাক তার সব আমলের প্রতিদান বাড়িয়ে দেন। তেমনি মুজাহিদ ইচ্ছা করলে জিহাদ চলাকালে রোযা না রেখেও পারে। বুখারী শরীফের এক হাদীসে বরং এমনও আছে যে, এক জিহাদের সফরে কতিপয় লোক রোযা রাখে, কতিপয় রোযা বর্জন করে। গন্তব্যে পৌঁছে রোযাদাররা ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়ে আর যারা রোযা রাখেনি, তারা কোন বিশ্রাম ছাড়াই উদ্দীপনার সাথে কাজ করে। এদের প্রসঙ্গে নবীজি (সাঃ) বললে ঃ যারা রোযা রাখল না, তারা-ই আজ সওয়াব নিয়ে গেল। (বুখারী, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৪০৪)

রোযার ন্যায় মুজাহিদের তিলাওয়াত, জিকর, নামায এবং অর্থব্যয়ের প্রতিদানও বাড়িয়ে দেয়া হয়। হযরত সাহ্ল ইবনে মু'আয আল-জুহানী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের সঙ্গী বানাবেন।' (সুনানে কুবরা বায়হাকী, খণ্ড ঃ ৯, পৃষ্ঠা ঃ ১৭২)

জান্নাতের প্রতিটি দরজা থেকে আহ্বান

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একটি জোড়া (যে কোন বস্তুর) ব্যয় করবে, জান্নাতের দ্বাররক্ষীগণ তাকে আহ্বান করতে থাকবে। জান্নাতের রক্ষীগণ বলবে, আসুন, আসুন, আমাকে দিয়ে প্রবেশ করুন।' শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তবে তো সেই ব্যক্তির কোন ভয় থাকবে না। নবীজি (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আশা করি, আপনিও তাদের মধ্যে থাকবেন।' (বুখারী, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৮)

মুজাহিদকে যুদ্ধের সরঞ্জাম দান করা এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর পরিবারের তত্ত্বাবধান করার প্রতিদান

হাদীস

হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথের যুদ্ধরত ব্যক্তিকে সরঞ্জাম দান করল, সে-ও যুদ্ধ করল। আবার যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে যুদ্ধরত ব্যক্তির পরিবারের তত্ত্বাবধান করল, সে-ও যুদ্ধ করল।

(বুখারী, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৯)

ব্যাখ্যা

কুরআন ও হাদীসের স্থানে স্থানে বিভিন্নভাবে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ এবং ব্যয় না করায় ধমকি প্রদর্শন করা হয়েছে। তাই নিম্নে তরজমা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ এতদসংক্রান্ত একটি আয়াত এবং কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ
وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

তরজমা ঃ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্‌র পথে এবং নিজের জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। আর সৎকাজ কর, যারা সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন। (বাকারা ঃ ১৯৫)

এ আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) লিখেছেন ঃ

'তোমরা আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) জানের সঙ্গে মালও ব্যয় কর। এক্ষেত্রে নিজের সম্পদ ব্যয় করায় কার্পণ্য প্রদর্শন করে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। জিহাদে জীবন উৎসর্গ করার পাশাপাশি অকাতরে সম্পদও ব্যয় না করলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে আর প্রতিপক্ষ হবে শক্তিশালী, যা ধ্বংসের-ই অপর নাম।' (মা'আরিফুল কুরআন, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭২)

তাফসীরে মাজহারীর প্রণেতা কাজী ছানাউল্লাহ পানীপতী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে 'সাবীলুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র পথ) দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদ। (তাফসীরে মাজহারী, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৭)

তিনি আরো লিখেছেন ঃ

'আমার মতে আলোচ্য আয়াতের মর্ম হল– হে মুসলমানগণ! তোমরা যদি জিহাদ ত্যাগ করে বস, তাহলে দুশমন তোমাদের মাথায় চড়ে বসবে, যার ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লামা বগবী (রহঃ) বলেছেন, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) অনবরত আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে কাটাতে শুরু করেন। জিহাদ করতে করতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন এবং কুস্তুন্তুনিয়ার (কনস্টান্টিনোপল) পানাহ নগরে চির নিদ্রায় শায়িত হন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মারা গেল; অথচ সে জিহাদ করল না, এমনকি মনে জিহাদের কল্পনাও করল না; সে এক প্রকার মুনাফিক অবস্থায় মারা গেল।' (তাফসীরে মাজহারী, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪৮)

ইমাম বুখারী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আয়াতটি জিহাদে ব্যয় করা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (বুখারী, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৬৪৮)

ইমাম বুখারীর এ অভিমতের ব্যাখ্যা মুহাশ্‌শী (রহঃ) এভাবে করেছেন–

الظاهرُ أن مُرادَهُ النَّفَقَةُ فى الجهادِ فإنه لَوْلَمْ يُنْفِقْ فِيهِ غَلَبَ عَلَيْهِمُ الكفارُ وَأَهْلَكُوهُمْ

'বলা বাহুল্য যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জিহাদে ব্যয় করা। কেননা, জিহাদে সম্পদ ব্যয় করা না হলে কাফিররা মুসলমানদের উপর জয়ী হয়ে যাবে এবং তারা মুসলমানদের ধ্বংস করে দেবে।'

(বুখারীর টীকা, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৬৪৮)

আয়াতের শানে নুযূল

আসলাম আবু ইমরান বলেন, একবার আমরা মদীনা থেকে কুস্তুন্তুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) অভিমুখে রওনা হই। আব্দুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনে অলীদ আমাদের আমীর। পথে বিশাল এক রোমান বাহিনী আমাদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসে। আমরাও সংখ্যায় অনেক। সারিবদ্ধভাবে আমরা তাদের প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে যাই। হঠাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি একাকী রোমানদের উপর হামলা করে বসে এবং তাদের সারিতে ঢুকে পড়ে। সঙ্গীরা চীৎকার করে বলে উঠে যে, 'হায়! হায়! লোকটা নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করল!' একথা শুনে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রহঃ) বলে উঠলেন, 'লোক সকল! তোমরা আয়াতটির ভুল ব্যাখ্যা করছ। এ আয়াত তো আমরা আনাসারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। ঘটনাটি এই ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইসলামের বিজয় দান করেন এবং ইসলামের সমর্থক-সহযোগীর সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন আমরা কানাঘুষা করলাম যে, আল্লাহ্ তো ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। এখন আর জিহাদের প্রয়োজন নেই। যুদ্ধে আমাদের বিপুল সম্পদ নষ্ট হয়েছে। এস, এখন আমরা সে সবের প্রতিকারে আত্মনিয়োগ করি, সহায়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করি। তার-ই প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৪ – কাশ্‌শাফ, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ২৩৭ – মাজহারী খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৮

আয়াতে تَهْلُكَه (তাহলুকা) দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পদ রক্ষা ও ক্ষতিপূরণে জিহাদ বর্জন করা (মাজহারী, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৮)

জিহাদে সম্পদ ব্যয় না করা আর নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা সমান কথা

জিহাদে সম্পদ ব্যয় না করা আর নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া সমান কথা। কেননা, আল্লাহ্ যাদেরকে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তারা যদি অর্থ দ্বারা মুজাহিদের সহযোগিতা না করে এবং অর্থ দিয়ে মুজাহিদদের জন্য যুদ্ধের সরঞ্জামের ব্যবস্থা না করে, তাহলে মুজাহিদরা একদিকে দুর্বল হয়ে পড়বে অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে যাবে। শত্রুরা মুজাহিদদের উপর জয়লাভ করে মুসলমানদের সহায়-সম্পদ লুটে নেবে এবং মুসলমানদেরকে তাদের অত্যাচারের টার্গেটে পরিণত করবে। মুসলমানদের ঘাড়ে কুফরী আইন চাপিয়ে দেবে। এমতাবস্থায় জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য সম্পদ ব্যয় করায় কার্পণ্য করার অর্থ নিজেদেরকে অপমান ও ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা ছাড়া আর কী হতে পাবে?

সম্পদ দ্বারা জিহাদ করার প্রয়োজনীয়তা

যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সময় যোদ্ধা অপেক্ষা অর্থ সম্পদের প্রয়োজন বেশি হয়। কারণ, সামরিক সরঞ্জাম ব্যতীত যুদ্ধ হয় না। এ কারণে ইসলামে জিহাদে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপক ফজীলতের কথা বলা হয়েছে। অর্থ জিহাদের একটি মৌলিক উপাদান। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন জিহাদের ডাক দিতেন, তখন গরীব লোকেরাও জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য রাসূলের দরবারে এসে উপস্থিত হতেন। কিন্তু অর্থের অভাবে অনেক সময় তাদের জন্য অস্ত্র ও বাহনের ব্যবস্থা করতে পারতেন না। ফলে তারা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ফিরে যেতেন। অর্থাভাবে জিহাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তারা মনে যে ব্যথা পেতো, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে তার-ই বিবরণ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَلا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَأَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَيَجِدُوا مَا يُنْفِقُوْنَ *

"তাদেরও কোন দোষ নেই, যারা আপনার নিকট বাহনের জন্য আসলে আপনি বলেছিলেন, তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না। অর্থব্যয়ে অসামর্থজনিত দুঃখে তারা অশ্রুবিগলিত চোখে ফিরে গেল।' (তাওবা ঃ ১৯২)

এ কারণে প্রত্যেক ঈমানদারের অপরিহার্য কর্তব্য যে, যদি আল্লাহ্ পাক তাকে অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ করে থাকেন, সে যেন আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিজয় ও ঈমান-ইসলামের হেফাজতের জন্য তা থেকে ব্যয় করে। এ কাজে যেন সে কখনো হাত সংকুচিত না করে। কারণ জিহাদে অর্থ ব্যয় না করার প্রবণতা সমগ্র জাতির জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

আল্লামা আবু সউদ বলেন, সম্পদ ব্যয় না করে আটকে রাখা এবং সম্পদের প্রতি মহব্বত রাখা পতনের কারণ। এ কারণে কৃপণতাকে ধ্বংস বলে আখ্যা দেয়া হয়। (তাফসীরে আবুস্ সউদ, খণ্ড ঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৭) (চলবে)

তাফসীরুল কুরআন

ড. আল্লামা আব্দুল্লাহ আয্যাম (রাহঃ)

সূরা তাওবা ঃ আয়াত-১.২.৩

بَرَاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ * فَسِيحُوا فِى الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَأَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ * وَأَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللّٰهَ بَرِىءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ*

তরজমা

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সে সব মুশরিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা হল, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।

সুতরাং তোমরা চার মাস এদেশে নির্বিঘ্নে পরিভ্রমণ কর। আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন।

আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে লোকদের নিকট ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত। অবশ্য যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি বিমুখ হও, তাহলে জেনে নাও, তোমরা আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারবে না। আর আপনি কাফিরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

নাম ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এটি মদীনায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা, যার আয়াত সংখ্যা ১২৯। এ সূরায় মুসলিম সমাজের সাথে অন্যান্য সমাজের সম্পর্কের চূড়ান্ত স্বরূপ নির্ধারিত করা হয়েছে। তাছাড়া মুসলমানদের সাথে কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কের সীমাও নির্ধারিত করা হয়েছে।

এ সূরার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম তাওবা। কারণ এ সূরার ১১৭ নং আয়াতে আল্লাহপাকের ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের তাওবা কবুল করে তাদের উপর অনুগ্রহ করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ১১৮নং আয়াতে বিশেষভাবে তিনজন সাহাবী কা'ব ইবনে মালিক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে রবী (রাঃ)-এর তাওবা কবুল করে তাদের উপর অনুগ্রহ করার ঘোষণা বিবৃত হয়েছে।

এ সূরাটি সূরাতুল বারাআ নামেও প্রসিদ্ধ। বারাআ শব্দের অর্থ সম্পর্ক ছিন্ন করা। এ সূরায় মক্কার সকল গোত্রের সাথে কৃত মুসলমানদের সকল চুক্তি ছিন্ন ও বাতিল করা হয় এবং তাদের চার মাসের সময় প্রদান করা হয়। এর মধ্যে যেন তারা যেদিকে সুবিধা চলে যায় বা ইসলামের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

এ সূরার আরেক নাম 'আল ফাজিহা'। ফাজিহা শব্দের অর্থ অপমানকারী, লাঞ্ছনা দানকারী। কারণ এ সূরা মুনাফিকদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি আব্বাস (রাঃ) কে সূরা বারাআ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি ফাজিহা (অপমানকারী)। কারণ, এ সূরার বিভিন্ন আয়াতে মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। যেমন ঃ বলা হয়েছে-

والذين اتخذوا مسجدا ضراراً   ومنهم الذين يوذون النبى... ومنهم من عاهد اللّٰه   ومنهم من يلمزك فى الصدقات

এভাবে মুনাফিকদের আলোচনা অবতীর্ণ হতে থাকে। শেষে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম, হয়তো কারো উল্লেখ-ই বাদ পড়বে না। এভাবে এ সূরা মুনাফিকদের সকল ভেদ ও গোপন বিষয়ের আলোচনা করে তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে। এ কারণে এ সূরাকে সূরাতুল বুহূস ও সূরাতুল মুবাসারাও বলা হয়। বুহূস ও মুবাসারা অর্থ আলোচনা। এ সূরায় মুনাফিকদের গোপন ও রহস্যময় বিষয়সমূহের আলোচনা করা হয়েছে।

বিস্‌মিল্লাহ না লিখা ও তার প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ সূরাটিই কুরআনের একমাত্র সূরা, যার শুরুতে "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লিখা হয়নি। কেন লিখা হয়নি, এ প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি অভিমত রয়েছে।

১. জাহিলী যুগে আরবদের নিয়ম ছিল, তারা যদি কোন চুক্তি ভঙ্গ ও ছিন্ন করার ইচ্ছা করত, তখন তারা পত্র লিখে প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দিত। আর সে পত্রে বিস্‌মিল্লাহ লিখত না। আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরার মাধ্যমে রাসূল ও মুশরিকদের মাঝে বিদ্যমান চুক্তি ছিন্ন ও ভঙ্গের ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদের চারমাসের অবকাশ দিয়েছেন। তাই এ সূরাটিও বিস্‌মিল্লাহ ছাড়া অবতীর্ণ হয়েছে।

২. ইমাম নাসায়ী (রহ) তাঁর সূত্র পরম্পরায় উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি উসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম, যে নিয়মে কুরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস করা হয়-অর্থাৎ প্রথম দিকে শতাধিক আয়াত সম্বলিত বৃহৎ সূরাগুলো রাখা হয়। পরিভাষায় এ সূরাগুলোকে মি-ঈন বলা হয়। তারপর শতের কম আয়াত সম্বলিত সূরাগুলো রাখা হয়। পরিভাষায় এ সূরাগুলোকে মাসানী বলা হয়। সুতরাং কুরআন বিন্যাসের এই নিয়ম হিসাবে আগে সূরা তাওবা তার পর সূরা আনফাল লিখার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কেন আপনি তার ব্যতিক্রম করলেন? তদুপরি এ সূরা দু'টিকে মিশিয়ে লিখেছেন – মাঝে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখেননি। এর কারণ কি?

জবাবে উসমান (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট কোন আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি যারা অহী লিখতেন তাদের কাউকে ডাকতেন। তারপর বলতেন, এটা অমুক সূরার সাথে লিখে রাখ। আর সূরা আন্‌ফাল মদীনায় প্রথম অবতীর্ণ সূরাগুলোর একটি। আর সূরা তাওবা মদীনায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা। অথচ উভয় সূরার আলোচ্য বিষয় ও ঘটনাবলী প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ। ইন্তেকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের স্পষ্টভাবে বলে যাননি যে, সূরা তাওবা সূরা আন্‌ফালের অংশ। আমরা তখন ধারণা করলাম যে, সূরা তাওবা সূরা আন্‌ফালেরই অংশ। তাই এক সাথে মিশিয়ে লিখেছি এবং উভয় সূরার মাঝে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখিনি।

৩. খারীজা, আবু ইসমা প্রমুখ কুরআন বিশারদ তাবেঈ বলেছেন, হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে কুরআন সংকলন শুরু হলে রাসূলের সাহাবীদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিল। কতিপয় সাহাবী বললেন, তাওবা ও আন্‌ফাল একই সূরা। আর অন্যান্য সাহাবী বললেন, না, বরং দু'টি দুই সূরা। তাই যারা বলেছিলেন, দুই সূরা, তাদের মতের প্রতি লক্ষ্য রেখে দুই সূরার মাঝখানে কিছু জায়গা খালি রাখা হল। আর যারা এক সূরা বলেছিলেন তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে

'বিস্‌মিল্লাহির রাহমনির রাহীম' লিখা হল না। এ কারণে উভয় মতের সাহাবীরা সন্তুষ্ট হলেন এবং উভয়ের মতামতই কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হল।

৪. আব্দুল্লাহ ইবন্‌ আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আলী ইবন আবী তালেব (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম, সূরা তাওবার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম কেন লিখা হল না? উত্তরে তিনি বললেন, 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম বিদ্যমান। অথচ সূরা তাওবায় শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তিগুলো নাকচ করে জিহাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই, 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমনির রাহীম' লিখা হয়নি।

৫. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, সূরা তাওবার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ লিখা হয়নি। তার কারণ জিবরাঈল (আঃ) তা নিয়ে অবতীর্ণ হননি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে তা লিখতেন না। জিবরাঈল (আঃ) নিয়ে এলে তবেই তিনি লিখতেন। এখানে জিবরাঈল (আঃ) নিয়ে আসেননি তাই তা লিখা হয়নি।

তাফসীর

এ সূরাটি নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। এতে তাবুকের যুদ্ধ, যুদ্ধের প্রস্তুতি, যুদ্ধের পূর্বের ও পরের মদীনাবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরার কিয়দাংশ যুদ্ধের পূর্বে এবং কিয়দাংশ যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়। নবম হিজরীর রজব মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জীবনের এটিই শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পর রাসূল অন্য কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা হল ১. বদরের যুদ্ধ, দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে তা সংঘটিত হয়েছিল। ২. উহুদের যুদ্ধ, তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে তা সংঘটিত হয়েছিল। ৩. বনু নাজীরের যুদ্ধ, তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। ৪. মুরাইসী বা বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ, এ যুদ্ধ কখন ঘটেছিল, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন তা চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল আর অন্যরা বলেন তা ষষ্ঠ হিজরী সংঘটিত হয়েছিল। ৫. খন্দকের যুদ্ধ, যা পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। ৬. হুদায়বিয়ার যুদ্ধ, ষষ্ঠ হিজরীতে তা সংঘটিত হয়েছিল। ৭. খায়বরের যুদ্ধ, সপ্তম হিজরীতে তা সংঘটিত হয়েছিল। ৮. মূতার যুদ্ধ, অষ্টম হিজরীতে তা সংঘতি হয়েছিল। ৯. মক্কা বিজয়, অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে তা সংঘটিত হয়েছিল। ১০. হুনাইনের যুদ্ধ, অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে তা সংঘটিত হয়েছিল। ১১. তায়েফের যুদ্ধ, অষ্টম হিজরীর শেষ দিকে তা সংঘটিত হয়েছিল। ১২. তাবুকের যুদ্ধ, নবম হিজরীর রজব মাসে তা সংঘটিত হয়েছিল।

রাসূল (সাঃ) স্বপ্নে দেখলেন, তিনি বাইতুল্লাহ'য় উমরা পালন করছেন, তাওয়াফ করছেন। তখন তিনি ও তাঁর সঙ্গী চৌদ্দ শ' বা পনের শ' সাহাবী মক্কার পথে রওনা হলেন। ষষ্ঠ হিজরীর যীকা'দা মাসে তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন। কুরাইশ যখন শুনল যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাওয়াফ করতে আসছেন, তাদের উপস্থিতিতেই মুসলমানরা মক্কায় প্রবেশ করবে, তখন তারা দারুণ ক্ষীপ্ত হল। বলল, আমাদের উপস্থিতিতে কিছুতেই তারা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। এ পরিস্থিতিতে রাসূল (সাঃ) হুদায়বিয়ার যে অংশ হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেখানে অবস্থান নিলেন। নামাযের সময় হলে রাসূল (সাঃ) হারামের অংশে প্রবেশ করে নামায আদায় করতেন। তারপর পূর্বের স্থানে ফিরে আসতেন। হারামে নামায আদায়ের ফযীলত অর্জনের জন্য রাসূল (সাঃ) তা করছিলেন।

রাসূল (সাঃ) কাফিরদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার কথা শুনে বললেন, হায় কুরাইশের ধ্বংস! যুদ্ধই তাদের তিলে তিলে শেষ করে দিল! তাদের কি হত, যদি আরবদের জন্য আমার পথ উন্মুক্ত করে দিত? তাদের কি ক্ষতি হত, যদি আরবদের জন্য আমাকে ছেড়ে দিত! যদি তারা আমার উপর বিজয়ী হয়, তবে তারা তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। আর যদি আমি বিজয়ী হই, তবে তারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হবে। আর যদি তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তাদের তা করার শক্তি আছে। কিন্তু কুরাইশ কি ধারণা করে? যিনি আমাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ্‌ বিজয়ী করা পর্যন্ত আমি এই ধর্মের প্রচার করতেই থাকব অথবা এ পথেই আমি নিঃশেষ হয়ে যাব।

হুদাইবিয়ায় পৌঁছুলে রাসূলের উট বসে পড়ল। প্রহার করার পরও তা উঠল না। সবাই বলাবলি করতে লাগল, 'কাছওয়া (রাসূলের উষ্ট্রীর নাম) অবাধ্য হয়ে গেছে। কাছওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে।' রাসূল বললেন, 'কাছওয়া অবাধ্য হয়নি। এমনটি তার চরিত্রও নয়। তবে আবরাহার হাতীকে যিনি আটকিয়ে ছিলেন, তিনিই তাকে আটকিয়েছেন।' তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন, 'আজ কুরাইশরা যে প্রস্তাব নিয়ে আসবে, আমি তা-ই মেনে নেব। কুরাইশরা একের পর এক লোক পাঠাতে লাগল। তারা উরওয়া ইবনে মাসউদকে পাঠাল। উরওয়া ছকীফ গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি। তায়েফের সম্পদশালী ও সরদারদের অন্যতম। ছিল অন্ধ। সে এসে বলল, মুহাম্মদ! তুমি কি আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের একত্রিত করে নিজের গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ? সে হাত বাড়িয়ে রাসূলের দাড়ি মোবারক ধরতে চাচ্ছিল। সে যখনই হাত বাড়াত, তখনই মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) তরবারীর বাট দ্বারা তা প্রতিহত করতেন। মুগীরাও ছাকীফ গোত্রেরই লোক ছিলেন।

অবশেষে তিনি বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর দাড়ি স্পর্শ কর না। ওরওয়া বলল, কে এই লোকটি? উপস্থিত সাহাবীরা বললেন, মুগীরা। তখন ওরওয়া বলল, হে লজ্জায় কাতর ব্যক্তি! তুমি কি তোমার লজ্জার বিষয়টি ঢেকে রেখেছ? জাহেলী যুগে মুগীরা (রাঃ) লুণ্ঠনকারী ছিলেন, অত্যন্ত শক্তিধর ছিলেন। একদা তিনি কতিপয় লোককে হত্যা করে ফেললে উরওয়া ইবনে মাসউদ তাদের রক্তপণ আদায় করে দিয়েছিল এবং বিষয়টি গোপন রেখেছিল। ওরওয়া সে দিকেই ইঙ্গিত করেছিল।

মক্কার লোকেরা একের পর এক লোক পাঠাতে লাগল। অবশেষে সুহাইল ইবন্‌ আমরকে পাঠাল। তার সাথেই সন্ধিচুক্তির কথা চূড়ান্ত হয় এবং চারটি শর্তে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ হয়।

১. মুসলমানদের কেউ ইসলাম ত্যাগ করে কুরাইশদের নিকট ফিরে এলে কুরাইশরা তাকে গ্রহণ করে নিবে। কাফিরদের কেউ মুসলমান হয়ে রাসূলের নিকট এলে রাসূল তাঁকে গ্রহণ করবেন না।

২. এ সন্ধির চুক্তিতে যে কোন গোত্র রাসূলের সঙ্গে যোগ হতে চাইলে যোগ দিতে পারবে। আর কুরাইশদের সাথে শামিল হতে চাইলে শামিল হতে পারবে। এ ধারা মতে খুজাআ গোত্র রাসূলের সাথে শামিল হল আর বনু বকর গোত্র কুরাঈদের সাথে শামিল হল।

৩. দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হল।

৪. এ বৎসর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা মদীনায় ফিরে যাবেন। ওমরা আদায় করবেন না। আগামী বৎসর তরবারী কোষাবদ্ধ করে আসবেন এবং উমরা পালন করবেন।

এ ধরনের শর্তের কথা শুনে সাহাবীরা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। উমর (রাঃ) ধারণা করলেন যে, এতে মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও ক্ষতি রয়েছে। তাই তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নিকট এলেন। বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই? রাসূল বললেন, হ্যাঁ আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। উমর (রাঃ) বললেন, তারা কি মিথ্যায় প্রতিষ্ঠিত নয়? রাসূল বললেন, হ্যাঁ, তারা মিথ্যায় প্রতিষ্ঠিত। এবার উমর (রা) বললেন, তাহলে আমরা কেন আমাদের ধর্মে লাঞ্ছনাকর বিষয় অনুপ্রবেশের সুযোগ দিব? রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন, নিশ্চয় তিনি আমার রব। তিনি আমার ক্ষতি করবেন না। নিশ্চয় তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি কিছুতেই তার নির্দেশ অমান্য করব না।

এরপর উমর (রাঃ) আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। বললেন, আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই? আবূ বকর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উমর (রাঃ) বললেন, তারা কি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? আবু বকর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তারা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন উমর (রাঃ) বললেন, তাহলে কেন আমরা আমাদের ধর্মে লাঞ্ছনার বিষয় অনুপ্রবেশের সুযোগ দিব?

আবূ বকর (রাঃ) বললেন,'নিশ্চয় তিনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং তার সিদ্ধান্ত মেনে নিন। নিশ্চয় তিনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং তার সিদ্ধান্ত মেনে নিন।' (চলবে)

অনুবাদ ঃ আরশাদ ইকবাল

রক্তে রাঙ্গা চেচনিয়া
ইতিহাসের চলমান ট্রাজেডি বনাব বন্ধকী বিবেক

মাসুদ মজুমদার

চেচনিয়া। উত্তর ককেসাশের একটি ছোট্ট দেশ। ককেসাশ মানে অনেকগুলো পর্বতমালা। রাশিয়া-ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যবর্তী কৃষ্ণসাগর থেকে দক্ষিণ পূর্ব কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি প্রায় সাড়ে সাতশত মাইল। প্রধান পর্বতমালা বৃহত্তর ককেসাশ কয়েকটি তুষারাবৃত শৃঙ্গ সমষ্টি। কুরা নদীর দক্ষিণে ক্ষুদ্র ককেসাশ ইরানী মালভূমির সম্প্রসারিত অংশ।

এখানে গড়ে উঠে একটি মিশ্র জাতি-গোষ্ঠী। খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডারখ্যাত বাকু, গ্রেজনী মাইকপ, চিয়াতুরায় রয়েছে অনেক খনিজ সম্পদ। গ্রীকরা এই জনপদের সন্ধান জানতো অনেক আগ থেকেই। সারকেসিয়া, উঃ ককেসিয়া রুশ ফেডারেশনের অংশ হিসেবে চিহ্নিত হলেও আদি ইতিহাস রুশ-কেন্দ্রিক ছিলো না। রুশ ফেডারেশনের অংশ হিসেবে এর বিভাগ ছিলো জর্জিয়া, আজারবাইজান, আরমেনিয়া।

উনিশ শতকের একেবারে গোড়াতে মুসলমানরা প্রথমবারের মত রুশ অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। ১৮৫৯ সালে ইমাম শামিলের নেতৃত্বে মুসলমানরা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। রুশ ইতিহাস যেটিকে 'বিদ্রোহ' হিসেবে আখ্যায়িত করে। দুর্ভাগ্য, এই 'বিদ্রোহ' সফলতা পায়নি। এই জনপদের মানুষ রুশ ভাষায় আদৌও অভ্যস্ত নয়। এখানে ভিন্ন আদলে আরবির প্রচলন রয়েছে। তলস্তয় ও লারমনতক এর উপন্যাসে এবং পুশকিনের কবিতায় ককেসাশের যে জীবন চিত্রের প্রমাণ মিলে, এখানকার স্বাস্থ্য নিবাসের যে বর্ণনা, তা দিয়ে প্রমাণিত হয়- সমৃদ্ধ ও উন্নত সভ্যতার ছোয়াপ্রাপ্ত সভ্য মানুষদের আদি বসতি এই চেচনিয়া।

অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া চেচনিয়ার অধিবাসী প্রায় সবাই মুসলমান। মূল ভূখণ্ডটি ১ লাখ ৯৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে ১২ লাখ। কাসপিয়ান সাগর হতে বলকান সাগর পর্যন্ত প্রায় সোয়া তিনশ মাইল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে চেচেনদের আবাসস্থল, বাসস্থান। রাজধানী গ্রোজনী (গ্রজনি) নামকরা শিল্পনগরী। আজকের গ্রোজনী রক্তাক্ত জনপদ, বিধ্বস্ত নগরী। হানাদার রুশদের বর্বরোচিত হানায় চেচনিয়ার বরফকুচির সাথে বনি আদমের রক্ত আর রক্ত। রক্তাক্ত এই জনপদ শুধু চেচনিয়া নয়, পুরো ককেসাসের পর্বত কন্দরে রুশ শ্বেত ভল্লুক ও হায়নারূপী রুশ সৈন্যদের হিংস্র নখরের আঘাতে দগদগে ক্ষত আর খুনে রাঙ্গা প্রতিটি অঞ্চল এখন স্বাধীনতার প্রহর গুণছে।

চেচেনদের প্রচন্ড প্রতিরোধ সাম্প্রতিক বিশ্বকে কিছুটা নাড়া দিয়েছে। রাশিয়ার ক্ষমতার ভিতে কাঁপন ধরিয়েছে। স্বাধীনতার এ লড়াই, মুক্তির এই জিহাদ এখন বিশ্ব বিবেককে স্পর্শ করতে শুরু করেছে। অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছে এই জাতির ইতিহাস সম্পর্কে।

চেচেনরা মোঙ্গল ও তাতার জাতির একটি অভিন্ন রক্তধারা। তাদের সংগ্রামের ইতিহাসও অভিন্ন। বারো শতকের শেষ দিকে তাতাররা এশিয়ার বৃহৎ অংশ, ইউরোপের কিয়দংশ অধিকার করে। তাদের অগ্রাভিযান ছিলো কিংবদন্তির মত। কথায় আছে, তাতার-মোঙ্গলরা সামনে বাড়ালে পিছু তাকায় না। সেই দুর্ধর্ষ জাতির রক্তধারা ও উত্তরাধিকার চেচেন মুজাহিদরা। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা এই জাতির ইতিহাসের আদিপর্ব, সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহসহ কিছু বিশ্লেষণ ও দুনিয়ার সংবাদ মাধ্যমগুলোর খণ্ডচিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাবো। ইতিহাস মাত্রই বহুমাত্রিক বর্ণনা ধারণ করতে পারে। কিছু প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি ঘটলেও পূর্বাপর মিল ও সাযুজ্য রাখার স্বার্থে আমরা সীমিত পরিসরে হলেও একটু ইতিহাস চর্চার গোড়ায় যেতে চাই।

ইতিহাসের আদিপর্ব

যুগ যুগ ধরে চেচেনরা আজাদীর স্বপ্নকে সযত্নে বুকের গভীরে লালন করে পরাধীনতার শৃংখল ভাঙ্গার সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। জাতি হিসেবে চেচেনদের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, সর্বস্ব ত্যাগ করার সুমহান ঐতিহ্য। এই চেতনাকে জার এবং কমিউনিস্ট সরকার কেউ ধ্বংস করতে পারেনি। গোটা ককেসাশ অঞ্চলের জনগণের রয়েছে রুশ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঐতিহ্য। চেচনিয়া, ইংগুশতিয়া, দাগেস্তান এবং তাতারিস্তান একই ঐতিহ্যের সূত্রে গাঁথা। চেচনিয়ায় ইসলামের আগমন একটু বিলম্বে ঘটলেও ইসলামের জন্যে চেচেন মুসলমানদের জিহাদের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। সোভিয়েত মুসলমানদের মধ্যে চেচনীয়রা সর্বাধিক ধর্মপরায়ণ। দৃঢ় ঈমান তাদের পুরো জীবনাচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা নিজেদের ইসলামী চরিত্র অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে ঔপনিবেশিক রুশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের কমিউনিস্ট উত্তরসূরীদের গণহত্যার বিরুদ্ধে দুইশ' বছরেরও অধিক সময় পর্যন্ত জিহাদে লিপ্ত থাকে। ১৭৮৩ সালে ইমাম মনসুরের সময় এই প্রত্যক্ষ জিহাদ শুরু হয়। ১৯৪১-৪৩ সালে সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৯২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চেচেন মুসলমানরা বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

চেচনিয়ার একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের ইতিহাস রয়েছে। এই রাষ্ট্রে ইসলামী সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। রুশ সাম্রাজ্যবাদের থাবা এই রাষ্ট্রের ওপর বিস্তার লাভ করা সত্ত্বেও চেচেনদের মধ্যে একটি অভিন্ন ঐক্য বজায় ছিল। স্টেট অব মনসুর (১৭৮০-৯১), স্টেট অব শামিল (১৮৩৪-৬৪), রিপাবলিক অব নর্থ ককেশিয়ান মাউন্টেনিয়ার্স (১৯১৮-১৯), দ্য নর্থ ককেশিয়ান আমিরাত (১৯১৯-২০) এবং সোভিয়েত মাউন্টেন রিপাবলিক (১৯২০-২৪)। রাষ্ট্রগুলোই চেচেন মুসলমানদের গৌরবময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

সোভিয়েত কমিউনিস্টদের আগ্রাসন সত্ত্বেও বিভিন্ন ভাষাভাষী ককেশিয়ার উত্তরাঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে একতা বজায় আছে এবং বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা অভিন্ন ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধিকারী। তারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দিনে দিনে আরো সমৃদ্ধ করেছে। চেচেন, ইংগুশ এবং দাগেস্তানীরা হচ্ছেন ককেসিয়ার উত্তরাঞ্চলের সুন্নী মুসলমান। প্রত্যেক চেচেন ও ইংগুশ নিজেকে একজন মুক্ত,

স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাশীল নাগরিক বলে মনে করে। আরবী সাহিত্যের ওপর নির্ভর করে তাদের সাহিত্য বিকাশ ও সমৃদ্ধি লাভ করে। সেখানকার স্কুল, মাদ্রাসা এবং ইসলামী শিক্ষার বিকাশে আরবীকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে তাদের ঐক্য ও সংহতি জোরদার হয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে তারা সাম্রাজ্যবাদী জার ও সোভিয়েত কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে ব্যাপক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। রাশিয়ার জারেরা মুসলমানদেরকে খ্রীস্টান বানানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল।

জার ফিওদরের আমলে মুসলমান ও ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। ১৯২৪ সালে উত্তর ককেসাশে ইসলাম-বিরোধী ব্যাপক প্রচারণা, ১৯২৮ সালে সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হামলা চালানো হয়। রুশ কমিউনিস্টরাও জারদের মত চেচেন মুসলমানদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়। চেচেন মুসলমানরা তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে ১৮ শতকের পর থেকে যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। শেখ মনসুর ও শেখ ইসমাইলের নেতৃত্বে রুশ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে চেচনিয়া ও ইংগুশতিয়ার মুসলমানরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নতুনভাবে সংগঠিত হবার প্রয়াস শুরু করেন। বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্যাতনে প্রায় অর্ধেক চেচেন মৃত্যুবরণ করে। স্তালিনের মৃত্যুর পর মুসলমানরা আবার তাদের বাড়িঘরে ফিরে আসে এবং নতুনভাবে সংগঠিত হয়। বর্তমানে রাশিয়া তাদের পুরনো সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় চেচনিয়ার মুসলমানদের চিরদিন গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তাতারদের একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। ককেসাশ তাতার ও চেচেনদের মিলে সমন্বিত ইতিহাসের যে চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি সেটি আরো চমকপ্রদ।

নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পেলেও আমরা অজানা সেই ভুলে যাওয়া ইতিহাসের দিকে খানিকটা আলোকপাত করতে পারি।

একসময় প্রায় সমগ্র রাশিয়া ও সাইবেরিয়ায় তাতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ অঞ্চলে তাতারদের এক বিশাল সাম্রাজ্য পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত অটুট ছিল। পরে এই সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে খানদের শাসনাধীন হয়ে পড়ে। খানদের এই রাজ্যগুলো কালক্রমে কিছু উসমানীয় তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। কিছু দখল করে নেয় রাশিয়ার চতুর্থ জার 'ইভান'। তাতারদের দুর্ভাগ্যের সূচনা এখান থেকেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরাট অংশ মিত্র শক্তির মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায়। রুশদের হাতে তাতাররা আটকা পড়ে যায়। পরে ১৯২০ সালে তাতার স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। নির্ভরযোগ্য ইতিহাস হচ্ছে –

ত্রয়োদশ শতকে তাতার অভিযানের সময় ককেসাশের ঐ অঞ্চলে চেচেন-তাতারদের আগমন ঘটে এবং সেখানে তারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। কাস্পিয়ান সাগর থেকে বলকান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার মধ্যে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো হচ্ছে ঃ ইঙ্গুশতিয়া, আবখাজিয়া, কারাচায়েভা, চেরকিস, কাবার, দিদিয়ান, বলকার, দাগেস্তান। একই সময় এসব এলাকাতেও মুসলমান বসতি গড়ে উঠে। ঐ সব এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানরাও তাতার জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। শাফী মাজহাবের অনুসারী।

তাতারের যেমন সংগ্রাম ও লড়াইয়ের ঐতিহ্য রয়েছে, তেমনি চেচেন, ইঙ্গুশ প্রভৃতিরও পৃথক ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে। রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চেচেনরা শুরু থেকেই লড়াই চালিয়ে আসছে। অষ্টাদশ শতকে ইমাম মনসুরের নেতৃত্বে চেচনিয়ায় গণজাগরণ ঘটে। ইমামের দেশপ্রেম ও বীরত্বের কথা চেচেনরা এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। ইমাম মনসুর ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চেচেনদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। এরপর তিনি কারারুদ্ধ হন এবং ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে রুশ কারাগারে ইন্তেকাল করেন। স্বাধীনতার যে মশাল ইমাম মনসুর চেচেনদের মধ্যে জ্বালিয়ে দেন, পরবর্তীকালে সে মশাল বহন করেন তার অনুসারীরা। ইমাম মনসুরের ৩০ বছর পর চেচেনদের নেতৃত্বে আসেন ইমাম শামিল। তিনি একটানা ৩৫ বছর নেতৃত্ব দেন। এই সময় চেচেনদের কেউ পরাস্ত করতে পারেনি। ককেসাসের এই প্রবাদ-পুরুষ গোটা ককেসাস অঞ্চলে ঈমান ও স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়ে দেন। তার নেতৃত্বাধীন বাহিনী জার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরণ লড়াই চালিয়ে গেছে। ১৮৩৪ সালের লড়াইয়ে চেচেনদের অর্ধেকের বেশি পুরুষ শাহাদাতবরণ করেন।

ইমাম শামিলের নেতৃত্বে চেচনিয়া, ইঙ্গুশতিয়া, দাগেস্তানসহ বিরাট এলাকা জুড়ে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দু'দশক এই খেলাফত টিকে থাকে। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে জার বাহিনীর সঙ্গে ইমামের বাহিনীর এক মারাত্মক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজয় বরণ করে এবং ইমাম শামিলের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা রুশ সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। এরপর ১৮৭৭ ও ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ককেশীয় মুসলমানরা বিদ্রোহের ঝান্ডা উত্তোলন করে। রুশ গৃহযুদ্ধের সময় তারা তাদের নেতা ওজুন হাজীর নেতৃত্বে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

রুশ বিপ্লবের পর ককেশীয় মুসলমানরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে। ঐ সময় তারা 'উত্তর ককেশাস স্বাধীন প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে দাগেস্তানে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে, তাতে চেচেনরাও শামিল হয়। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে স্ট্যালিন যখন জাতি হত্যার অভিযান শুরু করে তখনও চেচেনরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হয়। ১৯৪৪ সালে স্ট্যালিন চেচেন ও ইঙ্গুশদের কাজাকিস্তান ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেয়। এই সময় তাদের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন চলে। তাদের বাড়িঘর ও সহায় সম্পদ দখল করা হয়। টেনে-হেঁচড়ে গাড়িতে তুলে কাজাকিস্তানের মরু এবং সাইবেরিয়ার তুষার প্রান্তরে নিক্ষেপ করা হয়। এই বিতাড়ন অভিযানের সময় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথশ্রম ও বৈরী পরিবেশে মৃত্যুবরণ করে। ক্রুশ্চেভের আমলে ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে চেচেনদের স্বদেশে ফেরার অনুমতি দেয়া হয়। দেশে ফিরে এসে তারা দেখতে পায় তাদের সহায়-সম্পত্তি ভোগ দখল করেছে রুশরা। এভাবে একটি জাতিকে নির্মূল ও পরাধীন করার জন্যে রুশ জারতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা শত শত বছর ধরে এত কিছু করার পরও চেচেনরা বেঁচে আছে এবং এখন তারা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে।

১৯৯১ সালে রুশ সাম্রাজ্যের পতনের পর জবর দখলকৃত প্রায় প্রত্যেকটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। মধ্য এশিয়ার পাঁচটি মুসলিম প্রধান দেশ যথাক্রমে আজারবাইজান, কাজাকিস্তান, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানসহ অন্যান্য দেশ যেমন- আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, ইউক্রেন এবং বালটিক অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি দেশই মস্কোর নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একই প্রক্রিয়ায় চেচনিয়ার কৃতী সন্তান সোভিয়েট

বিমান বাহিনীর জাদরেল জেনারেল জোহার মোহাম্মদ দুদায়েভ ১৯৯১ সালের ১ নভেম্বর চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর আগে ১৯৯১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দুদায়েভ রাশিয়ান বিমান বাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে চেচনিয়া গিয়ে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।

১৯৯১ সালের ২৭ অক্টোবর দুদায়েভ চেচনিয়ার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নির্বাচনের আগেই তিনি চেচনিয়ার জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি নির্বাচিত হলে চেচনিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম করবেন। মস্কোর শাসকগোষ্ঠী সম্পদে ভরপুর স্বাধীন চেচনিয়ার অস্তিত্ব মেনে নিতে চায়নি। স্বাধীনতা ঘোষণা করার মাত্র এক সপ্তার মধ্যেই বরিস ইয়েলৎসিন ৭ নভেম্বর মস্কো থেকে চেচনিয়ার উপর জরুরী আইন জারি করে। মাত্র দু'দিন পর মস্কোর সাবেক কেজিবি সমন্বয়ে গঠিত বর্তমানে রাশিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক ও নিন্দনীয় বাহিনী হিসেবে খ্যাত ইনটিরিয়র মিনিস্ট্রি বাহিনীর প্রায় সহস্রাধিক সৈন্য চেচনিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। কিন্তু রাশিয়ান পার্লামেন্টের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ইয়েলৎসিন ১০ নভেম্বর এই বিশেষ সৈন্যদল ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। এরপরের তিন বছর বরিস ইয়েলৎসিন বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছে চেচনিয়ার স্বাধীন জাতিসত্তাকে ধ্বংস করতে। মস্কো কখনো বলেছে দুদায়েভ বেআইনী রাষ্ট্রপ্রধান, কখনও আবার পশ্চিমা দুনিয়াকে বুঝাতে চেষ্টা করেছে, চেচনিয়া হলো ক্রিমিনালদের স্বর্গরাজ্য।

মস্কো মিথ্যাচার দিয়ে একটা বিশেষ ক্ষেত্র তৈরী করতে চেয়েছিল তিনটি বছর। অথচ ভুলেও একথা স্বীকার করেনি যে, দুদায়েভ চেচনিয়ার নির্বাচিত নেতা এবং নির্বাচনের পূর্বে তিনি জনগণকে রাশিয়া থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হবার প্রতিশ্রুতি দেন। চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণায় উৎসাহিত হয়ে পার্শ্ববর্তী ককেশীয় রাজ্য যথাক্রমে- ইংগুশতিয়া, দাগেস্তান ওশেনেতিয়া ও আবখাজিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

উক্ত চারটি রাজ্যই মুসলিম প্রধান এবং খনিজ সম্পদে ভরপুর। রাশিয়ার নব্য সম্প্রসারণবাদীরা চেচনিয়ার স্বাধীনতা ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত হয় বিভিন্নভাবে। বিশেষ করে ১৯৯৪ সালের ১৩ জুন চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনীতে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত বিশেষ বাহিনী নগণ্য সংখ্যক সাবেক কমিউনিস্ট কর্মী দ্বারা ব্যাপক হাঙ্গামার চেষ্টা চালায়। ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রাশিয়ার প্যারা-মিলিটারী কমিউনিস্ট ও উগ্রপন্থীরা চেচনিয়ায় প্রত্যক্ষ আক্রমণ শুরু করে। রাশিয়ান হেলিকপ্টার চেচনিয়ার বিভিন্ন তেল শোধনাগার ও পাওয়ার প্ল্যান্টে বোমাবর্ষণ করে। চেচনিয়ার কর্তৃপক্ষ রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে মস্কো তার জড়িত থাকার ব্যাপারটা অস্বীকার করে। নভেম্বর মাসের ২০ তারিখে প্রেসিডেন্ট দুদায়েভ চেচনিয়ার সকল ধর্মীয় নেতা ও স্থানীয় নেতাদের একটা বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। উক্ত অধিবেশনে দুদায়েভ ঘোষণা করেন যে, আজ থেকে চেচেনিয়া সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী চলবে, অর্থাৎ তিনি চেচনিয়াকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় বরিস ইয়েলৎসিন ক্ষেপে যান। এই ঘোষণা পশ্চিমা বিশ্বকেও হতবাক করে দেয়।

চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট জোহার দুদায়েভ এই মর্মে অভিযোগ করেছেন যে, হানাদার রুশ বাহিনী ১ লাখ চেচেনকে খুন করেছে এবং এই ভাগ্যাহত নিরপরাধ চেচেনদের অধিকাংশই নারী, শিশু ও বৃদ্ধ। চেচেন প্রেসিডেন্ট রুশ হামলার সুদূরপ্রসারী দূরভিসন্ধি সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলেন,রুশদের এই গণ হত্যাকান্ডের উদ্দেশ্যে হচ্ছে, চেচেন জনগণকে পুরোপুরি নির্মূল বা উচ্ছেদ করা। রাশিয়ার স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন বলেছে, রুশ বাহিনীর এই নির্মমতা প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনের জন্য অশুভ পরিণতি বয়ে আনতে পারে। রুশ মানবাধিকার কমিশনের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়, চেচনিয়ায় রুশ অভিযানের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত ব্যাপক, যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে পোল্যান্ডে নাজী অভিযানের সাথে তুলনীয়।

ঘটনার পুনরাবৃত্তি

'৯৪ সালে চেচনিয়ার সাথে সংঘটিত প্রচন্ড যুদ্ধে রাশিয়া অত্যন্ত অপমানজনকভাবে পরাজয় বরণ করে। তারপরও তারা চেচনিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি না দিয়ে চেচেন প্রেসিডেন্ট মাসখদভের সাথে ৫ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু চুক্তির ৩ বছরের মাথায় রাশিয়া আকস্মিকভাবে চেচনিয়ায় সর্বাত্মক হামলার মাধ্যমে সেখানে গণহত্যা চালাচ্ছে। চেচনিয়ার ওপর আবারো আগ্রাসী যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে রাশিয়া ১৯৯৬ সালের চুক্তিই কেবল লংঘন করেনি বরং অতি কাপুরুষোচিত, অমানবিক ও অসাংবিধানিক কর্মের পুনরাবৃত্তি করেছে।

১৯৯৪-৯৬ সালের যুদ্ধের সময় চেচনিয়ায় হামলা চালানোর অমানবিক ও অসাংবিধানিক আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে খোদ রাশিয়ারই ৬ জন সেনানায়ক পদত্যাগ করেছিলেন। পার্লামেন্টেও প্রতিবাদের ঝড় ওঠেছিল।

চেচনিয়া হচ্ছে রুশ ফেডারেশনের ২১টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মধ্যে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাতন্ত্র। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এক গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রায়ের ভিত্তিতে চেচনিয়াও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। রুশ বিমান বাহিনীর সাবেক জেনারেল জওহর দুদায়েভ প্রজাতন্ত্রটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সাম্রাজ্যবাদী রুশ প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই মুসলিম প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেননি। রুশ শাসক চেচনিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণাকে বিচ্ছিন্নতা বলে আখ্যায়িত করে এই উদ্যোগ কঠোর হস্তে দমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার তিন বছর পর্যন্ত চুপচাপ থেকে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ করে ইয়েলৎসিন চেচনিয়ায় সামরিক বাহিনী প্রেরণ করে। তিনি সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ৪০ হাজার সৈন্য পাঠান। রুশ বাহিনীর অগ্রাভিযান চেচেন সীমান্তে এসে বাঁধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চেচেন মহিলারা রাস্তার সামনে ব্যারিকেড রচনা করে। এভাবে পুরো এক সপ্তাহ রুশ ট্যাংক বহরকে ঠেকিয়ে রাখা হয়। ৫ মাস একটানা যুদ্ধে রাশিয়ার শত শত সৈন্য নিহত হয়। চেচেনদের গেরিলা রণকৌশলের কাছে রুশ বাহিনী হার মানতে বাধ্য হয়। চেচনিয়ার কয়েক হাজার রুশ সৈন্য নিহত হওয়ায় নিহত সৈন্যদের পরিবারবর্গ রাশিয়ায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু করে। প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিনের জন্যে চেচনিয়া সংকট এক বিরাট রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলেকজান্ডার লেবেদকে সংকট সমাধানের দায়িত্ব দেন। ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে ক্রেমলিনে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইয়েলৎসিন দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর যুদ্ধবিরতির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে চেচনিয়ায় পুনরায় হামলা করার জন্যে রুশ বাহিনীকে নির্দেশ দেন। রাশিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় মুজাহিদরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়

এবং রুশ বাহিনীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। মুজাহিদদের আচমকা হামলায় রুশরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। যুদ্ধে রাশিয়া প্রচণ্ড মার খায়। রাশিয়া আবার শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং ১৯৯৬ সালের ৩১ আগস্ট চেচেন চীফ অব স্টাফ ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট আসলান মাসখাদভ এবং জেনারেল লেবেদের মধ্যে আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালের ৩১ আগস্ট উভয় পক্ষ শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে। কিন্তু রাশিয়া শান্তি চুক্তি লংঘন করে একতরফা চেচনিয়ার ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ৫ বছর মেয়াদী চুক্তি অনুযায়ী ২ হাজার সালের ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত চেচনিয়ায় স্থিতাবস্থা বজায় থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিন বছর যেতে না যেতেই চুক্তি লংঘন করে রাশিয়া চেচনিয়ার ওপর এক অসম যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক চিত্র

আমরা জানি প্রলম্বিত এই জিহাদ একদিন চেচনিয়াকে স্বাধীনতা এনে দিবে। সেদিন আর দূরে নয় ইনশাআল্লাহ। কালেমাখচিত চেচনিয়ার স্বাধীন পতাকা আকাশ স্পর্শ করবে। সাম্প্রতিক কিছু সংবাদ চিত্র চেচনিয়ার মুক্তিযুদ্ধকে কিভাবে দেখছে তার বিবরণ হচ্ছে –

মস্কো থেকে রয়টার ঃ চেচনিয়া হানাদার রুশ বাহিনীর জন্য মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। মস্কো স্বীকার করেছে যে, গত এক সপ্তাহে মুজাহিদদের আক্রমণে ১৫৬ জন রুশ সৈন্য নিহত হয়েছে। চেচনিয়ার যুদ্ধ এখন রুশদের জন্য এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর্যায়ে পদার্পণ করেছে। চেচেন মুজাহিদরা সমগ্র চেচনিয়ায় সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং রুশ বাহিনীর উপর অতর্কিতে আঘাত হানছে।

গত সপ্তাহে গ্রোজনীর কাছে মুজাহিদদের এক আক্রমণে ২০ জন আধাসামরিক পুলিশসহ বহু সৈন্য নিহত হয় এবং সলেমান তাউমেনে রাশিয়ার দুর্ধর্ষ ছত্রী সৈন্যের ৮৪ সদস্যের একটি কোম্পানীর সকলেই নিহত হয়। এতে চেচনিয়ায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রায় ছয় মাসব্যাপী যুদ্ধে রুশ বাহিনী জয়ী হয়েছে বলে মস্কোর দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

চেচেন মুজাহিদদের ইন্টারনেট ওয়েবসাইট-কাভকাজ ডট অর্গ জানিয়েছে, শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন মুজাহিদ কমান্ডার নিহত হবার রুশ খবর মিথ্যে। আবর বংশোদ্ভূত চেচেন মুজাহিদ মোহাম্মদ খাত্তাবের বরাত দিয়ে কাভকাজ ডট বার্তা জানায়, নিহত মুজাহিদরা কিভাবে যুদ্ধ করেন রাশিয়া শিগগিরই তা উপলব্ধি করতে পারবে।

চেচনিয়ার উচ্চ পার্বত্য গ্রাম উলুস-কার্ট ও সালমান উসেন গ্রামের কাছে এক সপ্তাহ ধরে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। পার্বত্যাঞ্চলের পাদদেশে অবস্থিত কমসোল স্কয়ারেও সপ্তাহ ধরে তীব্র যুদ্ধ চলছে। এনটিভি টেলিভিশনের একজন সাংবাদিক কমসোলস্কায়ার রণাঙ্গণ থেকে জানান, এই গ্রামটিতে দেড় হাজার মুজাহিদ অবস্থান নিয়েছে। এর আগে রুশরা তাদের সংখ্যা মাত্র ২৫/৩০ জন বলে জানিয়েছিলো। পরে তারা তাদের ধারণা ভুল ছিলো বলে জানায়।

মুজাহিদরা পুনরায় বড় আকারে সংগঠিত হয়ে আক্রমণ চালাতে পারবে না বলে রুশরা যে ঘোষণা দিয়েছিলো এতে তাও মিথ্যা প্রমাণিত হয়। রাশিয়া চেচনিয়ার মুজাহিদদের সংগঠিত প্রতিরোধ ধ্বংস করে দিয়েছে বলে দাবী করার পরপরই মুজাহিদদের বড় ধরনের কয়েকটি সফল আক্রমণ ও রুশদের বিপুল প্রাণহানিতে ককেশাস অঞ্চলে রুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মস্কোর সামর্থ্যের ব্যাপারে আবারও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

রাশিয়া সফররত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেছেন, তার আলোচ্যসূচীতে চেচনিয়ার বিষয়টি থাকলেও তা গৌণ বিষয়। তিনি দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্পর্ক জোরদারের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

মস্কো থেকে এএফপি ঃ স্বাধীনতাকামী চেচেন মুজাহিদরা একটি কার্যকর পাল্টা হামলার দাবীর সমর্থনে নিজেদের মরণপণ অতর্কিত গেরিলা হামলার একটি লোমহর্ষক ভিডিও প্রকাশ করার মাধ্যমে চেচনিয়ায় রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরোধ যুদ্ধ জোরদার করেছে।

মুজাহিদরা গত শুক্রবার জানায় যে, তারা মাত্র একদিন আগে রুশ নিয়ন্ত্রণ রেখার অভ্যন্তরে একটি সফল গেরিলা হামলা চালিয়ে ২৪ জন ফেডারেল সৈন্যকে হত্যা করেছে। তাছাড়াও তারা নিজেদের প্রতিরোধ যুদ্ধ জোরদার করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

শীর্ষ পর্যায়ের একজন চেচেন মুখপাত্র জানান মুজাহিদরা গত শুক্রবার গ্রোজনীর ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত আলখান কালা উপকণ্ঠ দখল করে নিয়েছে। গত একমাস এই এলাকাটি রুশদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

মুখপাত্র মোভলাদি উদুগভ জানান, মুজাহিদরা একই সময়ে চেচনিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় পার্বত্য এলাকার পাদদেশে অবস্থিত দু'টি গ্রামে আকস্মিক হামলা পরিচালনা করে দখল করে নেয়। এর ফলে গ্রোজনীর পতনের এক মাস পর এই গ্রাম দু'টি মুজাহিদদের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

উদুগভ একটি অজ্ঞাত স্থান থেকে টেলিফোনে বলেন, এটা আমাদের হামলার সূচনা মাত্র। তিনি বলেন, এটা আমাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বৃটিশ বিবিসি টেলিভিশনে গতকাল শনিবার সম্প্রচারিত এক ভিডিওতে রুশদের ওপর চেচেন মুজাহিদদের গত বৃহস্পতিবারের সফল হামলার দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

চেচেন মুজাহিদরা নিজেরাই বিবিসির কাছে এই ভিডিও টেপটি হস্তান্তর করেছে। এর মাধ্যমে মুজাহিদরা রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের কার্যকর পাল্টা হামলার দাবীর সমর্থন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে।

রুশ কর্মকর্তারাও চেচেন মুজাহিদ হামলায় গত বৃহস্পতিবার তাদের ২৪ জন সৈন্য নিহত ও ২৯ জন আহত হবার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে।

চেচনিয়ায় রুশ সেনা দলের ওপর স্বাধীনতাকামী চেচেন মুজাহিদরা আরো হামলা চালিয়েছে। মুজাহিদরা রাজধানী গ্রোজনীর দক্ষিণে পাহাড়ী এলাকায় তাদের ঘাঁটি থেকে রুশ সেনা বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

রুশ অধিনায়করা বলছেন, মুজাহিদরা যাতে তাদের ঘাঁটি ছেড়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়, সেজন্য এলাকার গ্রামগুলোর ওপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছে। রাশিয়ার নিরাপত্তাবাহিনী জানায়, তাদের এই তৎপরতা সত্ত্বেও কিছু পুলিশ ঐ আক্রমণে আহত হয়েছে। কিন্তু অতর্কিত অপর এক আক্রমণে ৭৫ জন রুশ সৈন্য নিহত হওয়ার খবর মস্কো অস্বীকার করেছে। গত শুক্রবার অর্জুন খাদে রুশ সৈন্যদের ওপর অতর্কিত মুজাহিদ হামলায় উক্ত ৭৫ জন সৈন্য নিহত হয়।

এদিকে দু'দিন আগে ৩৭ জন রুশ সৈন্য মুজাহিদদের অতর্কিত আক্রমণে নিহত হওয়ার পর রুশ সৈন্যরা এখন গ্রোজনীর ঘরে ঘরে তল্লাশী চালাচ্ছে।

রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষ বলছে, চেচনিয়ায় রুশ বাহিনীর ওপর চেচেন মুজাহিদদের এক অতর্কিত হামলার পর তারা ৩০ জনকে

গ্রেফতার করেছে।

বিভিন্ন সূত্রের ভিত্তিতে প্রণীত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, সর্বশেষ ঘটনায় রুশরা অত্যন্ত বিব্রত। রুশরা রাজধানী গ্রোজনীসহ যেসব এলাকা তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে বলে ধরে নিয়েছিল, সেসব জায়গা তাদের জন্যে ততোটা নিরাপদ নয়। দু'দিন আগে স্বরাষ্ট্র দফতরের একটি ইউনিটের ওপর গ্রোজনীর উপকণ্ঠে মুজাহিদরা হামলা চালায়। মুজাহিদরা শহরটিতে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারছে। রুশ সৈন্যরা এখন হামলাকারীদের খুঁজে বের করার জন্যে ঘরে ঘরে তল্লাশী চালাচ্ছে। রুশরা দাবী করছে যে, প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে।

রাশিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন এই হামলার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেজন্যে আমরা কি করতে পারি, আমাদের অসাবধান হওয়া উচিত নয়। এ সম্পর্কে এখন কোন কিছু বলা মুশকিল। আমার মনে হয়, যারা সামরিক তৎপরতায় এবং সামরিক বাহিনী মোতায়েনে নিয়োজিত তাদের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন করা যায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই। চেচনিয়ার গ্রামগুলোতে মুজাহিদদের আশ্রয় দেয়া হচ্ছে। চেচনিয়ার মানুষ রুশদের পছন্দ করে না। আর সম্ভবত তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে মুজাহিদদেরকে রুশদের হাতে তুলে দেবেন না। মুজাহিদরা তাদের কৌশল পরিবর্তন করেছে। মুজাহিদরা আগামী মাসগুলোতে তৎপরতা চালিয়ে রুশদের মনোবল ভাঙ্গতে পারবে এবং এ কৌশল খুব কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আরো কিছু সাম্প্রতিক সংবাদ একটি রণক্ষেত্র ঃ ভিন্নধর্মী বর্ণনা

মস্কো থেকে এএফপি॥ রাশিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন বলেছেন, চেচনিয়ায় তাদের অভিযান চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এদিকে রুশ জেনারেলেরা পাহাড়ী দক্ষিণাঞ্চলে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের দমনের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ২৬ মার্চ প্রথম দফা ভোট গ্রহণের আর মাত্র ১৬ দিন বাকি। এ মুহূর্তে ক্রেমলিন প্রধান কৌশলগত স্থান কমসোমোল স্কয়ার দৃঢ় প্রতিরোধ নিয়ে বিরত রয়েছেন। এনটিভিতে প্রদর্শিত যুদ্ধের দৃশ্যে দেখা গেছে, রাশিয়ার সৈন্যরা কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সুরক্ষিত গ্রামের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় অগ্রবর্তী ট্যাঙ্কের পিছনে গুটি গুটি মেরে এগুচ্ছে।

পুটিন বলেন, তিনি চেচনিয়া পুনর্দখল করার পর সেটিকে সরাসরি ক্রেমলিনের নিয়ন্ত্রণে আনার পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু এক সপ্তাহের প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর দেখা যাচ্ছে মুজাহিদদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

সামরিক কর্মকর্তারা জানান, গত সপ্তাহে ১শ' ৫৬ জন সৈন্য নিহত হয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইগর সের্গেইয়েভ স্বীকার করেছেন যে, ২৯ ফেব্রুয়ারী রাতের যুদ্ধে ৮৫ জন প্যারাট্রুপার নিহত হয়েছে।

সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান ভালেরী মানিলভ বলেছেন, রাশিয়ার সৈন্যরা ১ অক্টোবর থেকে চেচনিয়ার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দমন অভিযান শুরুর পর থেকে সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ১ হাজার ৫শ' ৫৬ জন সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে।

বাণিজ্যিক দৈনিক কমার্সেন্ট পত্রিকার সঙ্গে দেয়া সাক্ষাৎকারে পুটিন প্রথমবারের মত ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, চেচনিয়ার অবিলম্বে রুশপন্থী সরকার বসানোর কোন পরিকল্পনা নেই।

'লৌহ মানব' শিরোনামে কমার্সেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে পুটিন বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে আমরা সম্ভবত কয়েক বছরের জন্য চেচনিয়ায় সরাসরি প্রেসিডেন্টের শাসন চালু রাখবো।

মস্কো থেকে রয়টার॥ চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনীর দক্ষিণে আরগুন গিরিসংকটে চেচেন মুজাহিদদের এক আক্রমণে ৩১জন রুশ সৈন্য নিহত হয়েছে। দু'পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় আরো বহু রুশ সৈন্য আহত হয়।

একজন শীর্ষস্থানীয় রুশ জেনারেল গতকাল সোমবার রুশ সেলভিশনকে একথা জানান।

জেনারেল গেনাডি ট্রশেড বলেন, সম্প্রতি উলুসকাট ও সেলেমানতাউসেন গ্রামে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চেচেন মুজাহিদরা আরগুন গিরিসংকট থেকে সমতলের দিকে রুশ ব্যূহ ভঙ্গ করার চেষ্টার সময় এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

উত্তর ককেশাসে রুশ বাহিনীর প্রথম ডেপুটি কমান্ডার জেনারেল ট্রশেড বলেন, "আমরা রুশ বাহিনীর হতাহতের ঘটনা রোধ করতে পারছি না। কিন্তু হতাহতের বিষয়ে কথা বলাও কঠিন।" তিনি বলেন, চেচেনরা ছত্রীসেনার ষষ্ঠ কোম্পানীর ওপর হামলা চালায়। এতে ৩১জন সৈন্য নিহত হয় এবং বহু আহত হয়।

সরকারী আরটিআর টেলিভিশনের একজন রিপোর্টার বলেন, ছত্রীসেনারা শুক্রবার দু'টি গ্রামের কাছে অবস্থান গ্রহণ করার পর পরই একহাজার চেচেন মুজাহিদের একটি দল তাদের ওপর হামলা চালায়।

গত বৃহস্পতিবার চেচেন মুজাহিদদের আক্রমণে রুশ ক্রাক ওমেল পুলিশের ২০ জন সদস্য নিহত হবার ঘটনা রুশ সামরিক কর্মকর্তারা তদন্ত করছেন। রুশবাহিনী গত মাসে গ্রোজনী দখল করে নেয় এবং আশা করছে যে, চেচনিয়ায় তাদের অর্ধ বছরের হামলার শিগগিরই অবসান ঘটবে। তবে চেচেন মুজাহিদরা বলেছেন, তারা রুশদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

গ্রোজনী এখনও চেচেন মুজাহিদদের হাতে। অবিশ্বাস্য হলেও কথাটি সত্য। রুশ জেনারেলরা গর্ব করে বলেছিলেন, তারা বড়দিনের (২৫ ডিসেম্বর) আগেই গ্রোজনী দখল করবেন। নতুন খৃষ্টীয় শতকের ১ জানুয়ারি রুশ সৈন্যরা বিজয় উৎসব পালন করবেন গ্রোজনীতে পতাকা উড়িয়ে আর ভৎকা খেয়ে। কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। জানুয়ারি মাস শেষ হয়ে গেল এখনও কিন্তু গ্রোজনী অকুতোভয়, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী চেচেন মুজাহিদদের হাতে। সামরিক বিবেচনার দিক থেকে বিষয়টি অবিশ্বাস্য। রাশিয়া এখনও দুনিয়ার দু-নম্বর পরাশক্তি। দূরপাল্লার কামান, আধুনিক বোমারু বিমান, র‍্যাডার নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র, ফৌজের সংখ্যা— সব কিছুতেই রাশিয়া দুনিয়ার সেরা দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় ক্ষুদ্র দেশ চেচেনিয়ার মুসলিমদের পদানত করার জন্য তারা প্রয়োগ করেছে সমস্ত শক্তি। সামরিক বিশেষজ্ঞরা তো বলেই ফেলেছেন, সংখ্যাল্পতা নয়, ববং অস্ত্র ও ফৌজের আধিক্যই রুশদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাশিয়ানরা চেচেনিয়ায় এত বেশি সৈন্য সমাবেশ ও যান্ত্রিক ইউনিট নিয়োগ করেছে যে, তাদের ঠিকমত 'কাজ' দেওয়া যাচ্ছে না।

সর্বশেষ খবর হচ্ছে, রুশ সেনারা রাজধানী গ্রোজনীর বড় বড় বিল্ডিংগুলোতে বোমা ও রকেট দ্বারা লাগাতার আক্রমণ করে যাচ্ছে। আর স্থলপথে রুশ সেনারা গ্রোজনীর বরফঢাকা রাজপথ ও অলিগলি দিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে গ্রোজনীর কেন্দ্রের দিকে এগুতে চাইছেন। কিন্তু এ পথ বড় ভঙ্গুর। রাশিয়ানরা গত দেড় সপ্তাহ ধরে গ্রোজনীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 'মিনটকা

স্কোয়ারটি' দখলের জন্য রুশ ফৌজ প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ এই স্থানটি কৌশলগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মি. ইগর সাজারইভ-এর মতে, রাশিয়ানরা শীঘ্রই এই লড়াইতে তুমুল সাফল্য লাভ করবে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেন, হানাদার রুশ সেনাদের গ্রোজনীতে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অবশ্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী সারজাইভ দাবি করেছেন, আমাদের ক্ষতি থেকেও মুজাহিদদের লোকসান অনেক বেশি।

নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের মতে, বড় বড় দাবি সত্ত্বেও রুশ সৈন্যরা খুব অল্পই অগ্রসর হতে পারছে। ও.আর.টি টেলিভিশনের খবর হচ্ছে, মুজাহিদ নিশানাবাজরা বহুতল বিল্ডিংগুলো থেকে অগ্রসরমান রুশ সেনাদের ওপর তীব্র গুলিবর্ষণ করে চলেছে।

শেখানভা এবং মুসারভা স্ট্রিটের রুশ সৈন্যরা ভীষণ গোলাবারির সম্মুখীন হয়। শেষ পর্যন্ত রুশরা ট্যাঙ্ক, কামান ব্যবহার করে। বহুতল অট্টালিকাগুলোর উপরের তলাগুলো প্রায় গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু মুজাহিদবাহিনী তার আগেই রাস্তা দু'টি থেকে সরে পড়ে। গ্রোজনীর কাছাকাছি মিচুরিনিস্কি শহর থেকেও তীব্র লড়াই-এর খবর পাওয়া গেছে। অথচ রুশ ফৌজরা দাবি করেছিল তারা শহরটি দখল করে নিয়েছে। মুজাহিদ সূত্র থেকে বলা হয়েছে, শহরটির অধিকাংশই এখনও তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গ্রোজনীর মুজাহিদ কমান্ডার আসলান বেগ ইসমাইলিয়ভ সাংবাদিকদের বলেন, গ্রোজনীতে অনেক অঞ্চল থেকে রাশিয়ান সেনাদের পিছু হটিয়ে আগের জায়গায় ফেরত পাঠানো হয়েছে, যেখান থেকে তারা জানুয়ারির শুরুতে হামলা শুরু করেছিল।

যুদ্ধ কভার করতে আসা সাংবাদিকরা বলছেন, মুজাহিদদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল নির্দ্বিধায় রাজধানী শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তারা খুব নিকট থেকে চারদিক দিয়ে রাশিয়ান সৈন্যদের উপর হামলা চালাচ্ছে। রুশ সেনারা এন.টি.ভি-কে বলেছে, গ্রোজনীতে মুজাহিদদের প্রিয় কৌশল হল, তারা শহরের আন্ডারগ্রাউন্ড পথ দিয়ে তিন জনের দলে বিভক্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কারও হাতে থাকে স্নাইপার রাইফেল, কারও হাতে মেশিনগান এবং কারও হাতে গ্রেনেড লাঞ্চার। এ ধরনের দু-তিনটি গ্রুপ অগ্রসরমান রুশ ইউনিটের উপর অতর্কিতে বিভিন্ন দিক থেকে হামলা চালায়। রাশিয়ানরা কামান ও ট্যাঙ্ক বাহিনী ডেকে আনার আগেই মুজাহিদরা ঐ এলাকা থেকে সরে পড়ে। সম্প্রতি যে রুশ সেনাপতি মিখাইল মালোফিয়েভ চেচেন গেরিলাদের হাতে মারা পড়েছেন, তিনি এই ধরনের একটি দলের হাতেই ধরা পড়েন। রাশিয়ার ইটারতাস নিউজ এজেন্সী জানাচ্ছে, চেচেনদের প্রতিরোধ এত তীব্র যে, সারাদিন কয়েক শ' হাত এগুতে পারলেই তাকে রুশরা বড় সাফল্য মনে করছে।

এ.পি. জানাচ্ছে, ইদানিং রাশিয়ান সৈন্যরা দিনের বেলায় বিল্ডিংগুলোর দখল নেয় এবং রাতের বেলা তা পরিত্যাগ করে পালিয়ে আসে। চেচেন মুজাহিদদের আক্রমণের ভয়ে রাশিয়ানরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

দুঃখের কথা হচ্ছে, ক্ষুদ্র দেশ চেচেনিয়ার ধ্বংসযজ্ঞ সমগ্র পৃথিবী নীরব হয়ে অবলোকন করছে। একমাত্র চেচেন মুজাহিদরা শীত ও বরফপাতকে উপেক্ষা করে সামান্য অস্ত্র নিয়ে অসীম বীরত্বের নজির রাখছেন। আল্লাহ্ ছাড়া তাদের সহায়তা করার জন্য কেউ নেই। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারী ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মানবাধিকার বডি এ সম্পর্কে ভোটাভুটি করেছে। রুশ বিদেশমন্ত্রী তাতে উপস্থিত ছিলেন। তারা কিন্তু রাশিয়ার ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি বা কোন কড়া বিবৃতিও দেয়নি। বরং বলেছে, চেচেন সংঘাত শেষ করার জন্য রাশিয়াকে তিনমাস সময় দেওয়া উচিত। এ হচ্ছে পাশ্চাত্যের মানবাধিকারের নমুনা।

অভিজ্ঞ বিশ্লেষকরা কি ভাবছেন

চেচেনদের দেশ রুশরা জয় করে। চেচেনরা চাচ্ছে রুশ পরাধীনতার এই বন্ধন ছিন্ন করতে। চেচেনদের এই স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা যদি সাহায্য করি, তবে তাতে দোষটা ঘটছে কোথায়! এই সব পত্র-পত্রিকা, মৌলবাদের নামে চেচনিয়াতে রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সাফাই গাচ্ছে মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। আগেরকার দিন হলে এসব পত্র-পত্রিকা হয়ত লিখতো, চেচেনরা প্রতিবিপ্লবী। খতম কর চেচেন প্রতিবিপ্লবীদের। কিন্তু রাশিয়া এখন আর বিপ্লবের ধ্বজাবাহী কোন দেশ নয়। চেচনিয়ায় রুশ অভিযান এখন একটি নিছক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মাত্র। সে হিসাবেই তার ব্যাখ্যা দিতে হয়। মুসলিম মৌলবাদের ভয়ে, এই নির্মম সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে সমর্থন করা যায় না। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে রুশরা এই অঞ্চলকে প্রথম দখলে আনতে পারে। কিন্তু চেচেনরা সুযোগ পেলেই করেছে বিদ্রোহ। ১৮৬৭, ১৮৭৭, ১৯০৫-এর চেচেন বিদ্রোহ ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে। এই সব বিদ্রোহ কোন 'মৌলবাদী' বিদ্রোহ ছিল না। ছিল রুশ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবার অভ্যুত্থান মাত্র। ১৯৪১-১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রুশ অধীনতা থেকে মুক্ত হবার মানসেই চেচেনরা গ্রহণ করতে চায় জার্মান সাহায্য। প্রতিবিপ্লবের নামে যাকে নির্মমভাবে দমন করা হয়। এ সময় নাৎসি (Nazi) বাদের প্রতি চেচেনদের কোন আদর্শিক টান ছিল না। কিন্তু ককেশাস অঞ্চলের কিছুটা জার্মানরা দখল করে নেবার পর তারা হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহী, স্বাধীন হতে পারবে, এই আশা নিয়ে।

ককেশাস অঞ্চল রুশ দেশ নয়। রুশরা এই অঞ্চল জয় করেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে। এই অঞ্চলকে তাই রাশিয়া হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে না। যদিও বর্তমানে একে দাবী করা হচ্ছে রাশিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে।

বর্তমানে যুদ্ধ চলেছে সরাসরি রুশ আর চেচেনদের মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীতে ঠিক এই পরিস্থিতি ছিল না।

চেচেনদের দেশের সঙ্গে লাগোয়া হলো জর্জিয়া। তারাও চেচেনদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা ভাবছে না। কয়েক বছর আগে তারা স্বাধীন হয়েছে রুশ নিয়ন্ত্রণ থেকে। আজ চেচেনদের বলা হচ্ছে মৌলবাদী। কিন্তু কোন দেশ মৌলবাদী হবে কি হবে না, সেটা তাদের ব্যাপার, অন্য দেশের ব্যাপার নয়। ১৯৩২ সালের দিকে রুশ কমিউনিস্টরা অভিযোগ করতো চেচেনরা 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্তালিন-এর হুকুমে, ৫,০০০০০ চেচেন নর-নারী ও শিশুকে বন্দী করে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল মধ্য এশিয়ায়। সেখানে শীতে, অনাহারে মৃত্যু ঘটেছিল বহু চেচেন-এর। যারা এত বিপদের মধ্যেও বেঁচে ছিল, ১৯৫৮ সালে তাদের ফিরতে দেয়া হয় চেচনিয়ায়। বিরাট এক ঘৃণা ও প্রতিহিংসা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে চেচেনদের মনে।

রুশ রাজনীতিতে বর্তমানে চেচেন যুদ্ধ হয়ে উঠেছে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

আগে যা ছিল না। ১৯১৭ সালে ঘটে রুশ বিপ্লব। এ সময় থেকে রাশিয়া হয়ে ওঠে বিশ্ব রাজনীতির বিশেষ বিবেচ্য। অনেকে ভাবতে আরম্ভ করে, বিশ্ব রাজনীতিতে নেতৃত্বে দেবে রাশিয়া। সারাবিশ্বে সে অবসান ঘটাবে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানের। জাতিসত্তার সমস্যা চাপা পড়ে কিছুদিনের জন্য। কিন্তু এক পর্যায়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে শুরু হয় রুশিকরণ। রুশ ভাষা শিক্ষা সবার জন্য করা হয় বাধ্যতামূলক। রাশিয়ানরা সর্বত্রই পেতে থাকে ভাল চাকরি। এর ফলে একটা রুশ বিদ্বেষ দানা বাঁধতে থাকে। অন্যান্য ধর্মের চাইতে সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলাম সম্পর্কে করা হতে থাকে সবচেয়ে বেশী অপপ্রচার। এর পশ্চাতে কাজ করে চলে কেবল মার্কসবাদ নয়, প্রাচীন রুশ খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসও। এই ইতিহাস আমাদের দেশের অনেকেরই জানা নেই।

রাশিয়ার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট পুতিন, এক সময় চাকরি করতেন গোয়েন্দা বিভাগে। তিনি একজন কুচক্রী, অনেক আগে থেকেই। বর্তমানে তিনি রাজনীতিতে সফল হতে চাচ্ছেন, রুশ জাতীয়তাবাদ এবং বহু আগে থেকে সঞ্চিত ইসলাম বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে।

ইম্প্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল একটি নতুন ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিচ্ছে

সাংহাই পাঁচ নামে পরিচিত চীন, কাজাখিস্তান, কিরঘিজিস্তান, রাশিয়া এবং তাজিকিস্তান সম্প্রতি সন্ত্রাসবাদ, আন্ত সীমান্ত অপরাধ দমন এবং নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। রাশিয়ার ইন্টার ফ্যাক্স বার্তা সংস্থা এই তথ্য জানিয়েছে। চীনের সাথে ১৯৯৬ সালে তার সাবেক প্রতিবেশী সোভিয়েত ইউনিয়নের ৪টি দেশের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার পর সাংহাই পাঁচ কথাটির উদ্ভব ঘটে।

এই পাঁচটি দেশ ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাদের নিরাপত্তা প্রধানদের দু'দিনব্যাপী বৈঠকের পর একটি স্মারক সাক্ষর করে। কিরঘিজিস্তানের রাজধানী বিশকেকে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তারা তথাকথিত বিশকেক গ্রুপ গঠন করতেও সম্মত হয়। এই বিশকেক গঠনের মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রধান জরুরী বিষয়ে অন্তত বছরে একবার বৈঠকে বসার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। ১৯৯৯ সালের পহেলা ডিসেম্বর কিরঘিজ প্রেসিডেন্ট আসকার আকাইয়েভ তাদের মধ্যকার বৈঠকের শুরুতে রাশিয়া, চীন, কাজাখিস্তান তাকিকিস্তান এবং উজবেকিস্তানের প্রতি অভিনন্দন জানান। কিরঘিজ প্রেসিডেন্ট তার ভাষায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় তাদের অভিনন্দন জানান। কিরঘিজ প্রেসিডেন্ট চেচনিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং উত্তর ককেশাস অঞ্চলের আঞ্চলিক সংহতি রক্ষা এবং সাংবিধানিক শৃঙ্খলা রক্ষায় তার সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি চীন কর্তৃক সংখ্যালঘু মুসলমানদের দমন করার লক্ষ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চীনের অভিযানের প্রতিও তার সমর্থন ব্যক্ত করেন। কিরঘিজ প্রেসিডেন্ট জিনজিয়াং-এর মুসলমান এবং তিব্বতের বৌদ্ধদের লক্ষ্য করে এই কথা বলেন।

কিরঘিজ প্রেসিডেন্ট আসকার আকাইয়েভ আফগানিস্তানকে অস্থিতিশীলতার উৎস বলে বর্ণনা করে। তিনি মধ্য এশিয়ায় গত ২০ বছর ধরে রাজনৈতিক ও সামরিক উত্তেজনার জন্যে আফগানিস্তানকে দায়ী করেন।

রাশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্লাদিমির রুশাইলো ঐ বৈঠকে চেচনিয়ার স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জঘন্য পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন। কাজাখিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরবেক সুলেমিনোভ বলেন, সন্ত্রাসবাদ আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনের ব্যাপারে স্বাধীন দেশসমূহের কমনওয়েল থেকে (সিআইএস) মধ্যে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও আঞ্চলিক সহযোগিতার ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে একটা ভূমিকা থাকা উচিত। রুশ এবং কিরঘিজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা ২০০০ সালে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্যে একটি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। রাশিয়ার টেলিভিশনের খবরে একথা বলা হয়। রুশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অবৈধ চোরাচালান, মাদক ব্যবসা এবং অপহরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

'সাংহাই পাঁচ' নামে পরিচিত পাঁচটি দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। তারা সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী পুনর্জাগরণ প্রতিহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার ইসলামী পুনর্জাগরণ রাশিয়ার জন্য অত্যন্ত মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়ার স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। চেচনিয়ায় অব্যাহতভাবে গণহত্যা চালিয়েও রাশিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছে না। চেচেন মুজাহিদরা শাহাদাতের পেয়ালা পান করে মৃত্যুকে জয় করে ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা নিয়ে গেরিলা কায়দায় রুশ হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আতংকের সৃষ্টি করেছে। রাশিয়াকে চেচনিয়ায় কঠিন মূল্য দিতে হচ্ছে। মুসলমানদের বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিলেও চীন জিনঝিয়াং-এ স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া ও চীনের এই আগ্রাসী থাবা থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মুসলমানদের পরস্পর অনৈক্য বিভাজনের কারণে চেচনিয়া ও মধ্যএশিয়ার মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে। তাই নির্যাতিত মুসলমানদের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য বিশ্ব মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ইসলাম বিরোধী খোদদ্রোহী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্যাতন ও নিষ্পেষণ থেকে রক্ষা করার জন্য নির্যাতিত মুসলমানদের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার জন্য মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। মুসলিম বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ সহায়তা পেলে চেচনিয়া একটি স্বাধীন মুসলিম দেশ হিসেবে অচিরেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলো নিজেদের তাহজীব তমদ্দুনকে ভিত্তি করে স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকবে।

শেষ কথা

চেচনিয়ার মুজাহিদরা মুক্তিযুদ্ধের চিরায়ত সংগ্রামকে তাদের জীবনের মিশন বানিয়েছে। কুরা ও তেরেক নদীর বরফগলা পানি আজ আর পানি নয়। মুজাহিদের খুন হয়ে জান্নাতের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এটি অসম যুদ্ধ। মানবাধিকারের বিরুদ্ধে-মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণ্যতম যুদ্ধ। সত্য-মিথ্যা তথা হক-বাতিলের এই যুদ্ধে দুনিয়ার কোন জাতিসংঘ, রাজা-বাদশা, শাসক সমর্থন দেবে না। এমন যুদ্ধের মদদদাতা একমাত্র আল্লাহ্।

বিশ্ববিবেকের টনক নড় ক আর নাইবা নড় ক শহীদী নজরানা কবুল করার একমাত্র মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন। তিনি আরশের প্রভূ। তিনি প্রত্যক্ষ করছেন চেচেন যোদ্ধারা শেষ রক্তবিন্দু কিভাবে বিলিয়ে দিচ্ছে। প্রতিজন মা কিভাবে সন্তানকে, স্ত্রী স্বামীকে,

বোন ভাইকে জিহাদের ময়দানে নওসার সাজে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

চেচনিয়ায় আজকের ঘটনাপ্রবাহ, বদর, ওহুদ, খন্দক, খায়বর, তাবুক কারবালার পুনরাবৃত্তি মাত্র। যে জাতি—যে মুজাহিদ লড়ে যায় একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, কালেমার ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখার জন্য, সেই জাতিকে দাবিয়ে রাখে, রুখে দিতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীর বুকে থাকতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে কাচের মত টুকরো টুকরো হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে, পাশ্চাত্য সভ্যতা নামক শয়তানী সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ আমরা প্রত্যক্ষ করবো বিধ্বস্ত চেচনিয়ার মুজাহিদদের রক্তভেজা মাটি থেকে উত্থিত বিপ্লবের প্রাণশক্তির ভেতর।

দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য, নিকটপ্রাচ্য, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দেশে দেশে মুসলমানদের বিপদকে আমরা ভাবি উত্থান ও জাগৃতির নবতর প্রেরণা। প্রতিটি জিহাদ ও মুক্তিযুদ্ধকে ভাবি আগামী ইতিহাস গড়ার সোনালী স্বপ্ন। জানি এ পথে ত্যাগ আর কোরবানীর যে অনুপম দৃষ্টান্ত রেখে যেতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা তথা আজকের বিশ্বের হীনবল মুসলমান আত্মপ্রবঞ্চিত। এটি একদিকের চিত্র মাত্র। অন্যদিকে, চেচনিয়া, বসনিয়া, কাশ্মীর, লেবানন, ফিলিস্তিন, আকিয়াব, পাঞ্জাব, মরোসহ দুনিয়া জুড়ে হাজারো জিন্দাদিল মুজাহিদ কাফনের কাপড় বেঁধে জিহাদের ময়দানে। আত্মপ্রবঞ্চনার বিপরীতে এ খুনরাঙ্গা ইতিহাস-ই তো আমাদের বাঁচার স্বপ্ন, অস্তিত্বের গৌরব, মুক্তির অভয় বাণী। হেরার রাজতোরণ স্পর্শের একমাত্র ঝিয়নকাঠি। মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় অনিবার্য, জালেমের উপর মজলুমের জয় অবশ্যম্ভাবী।

চেচেনদের মুক্তি আন্দোলন বিশ্ববিবেককে যতটা আহত করার কথা ছিল ততটা করেনি। কারণ চেচেনবাসীরা মুসলমান। ইসলাম তাদের আদর্শ। দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যেই তারা ককেসাশের এই ছোট্ট জনপদটিকে বাছাই করে নিয়েছে। পৃথিবীতে আরেকটি মুসলিম রাষ্ট্র অস্তিত্ব ঘোষণা করুক এটা বর্তমান বিশ্বের মানবাধিকারের ঠিকাদার ইহুদী-খৃষ্টানদের পুরোহিত, মুশরিকদের সর্দার কেউ কামনা করে না। এই সত্যের পাশাপাশি আরো একটি মুসলিম দেশ স্বাধীন-সার্বভৌম ঘোষিত হবার সাথে সাথে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করুক এই বিপ্লবী সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ মুসলিম নামধারী শাসকচক্রও।

পৃথিবীর মুসলমানরা কায়মনোবাক্যে কামনা করে ইসলামের বিজয়। কিন্তু তাদের শাসকরা কামনা করে তাগুত, শয়তান এবং তাদের প্রেতাত্মাদের ক্ষমতার দাপট ও বিজয়। মুসলিম জনতাও শাসকগোষ্ঠীর চিন্তা-বিশ্বাস ও প্রেরণাগত এই ফারাক দেশে দেশে মজলুম মুসলমানদের কাছ থেকে প্রকৃত জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত মুমিনদেরকে আড়াল করে রেখেছে।

মুসলিম উম্মাহ্‌র উপমা হচ্ছে এক দেহ, এক প্রাণতুল্য। বাস্তবতা হচ্ছে, প্রায় অর্ধশত মুসলিম দেশ ওআইসিসহ ডজনখানেক বিশ্ব মুসলিম সংস্থা শুধু নির্লিপ্তই নয়— নিস্পৃহ এবং প্রকারান্তরে জালেম-শোষক তথা শত্রুদের পক্ষে পরোক্ষ ভূমিকাই পালন করছে।

নবী আলাইহিস সালামদের ইতিহাস প্রমাণ করে, বিভ্রান্ত উম্মত-জাতিকে জান্নাতের পথ থেকে শুধু আড়াল করে না— ভুল পথেও পরিচালিত করে। আজকের প্রেক্ষাপট আমাদেরকে নতুন করে সবক দেয়। প্রতিটি ঈমানদার স্ব-উদ্যোগে স্বেচ্ছায় নিজস্ব বিবেককে জাগ্রত করে যেখানে মজলুম মুসলমান জিহাদের ময়দানে সক্রীয় সেই সব মুজাহিদদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে হবে। সাধ্য থাকলে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে ঈমানের পরীক্ষাকে মানোত্তীর্ণ কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে।

বাংলা সেই মুসলিমদের জনপদ, যাদের ইতিহাস বালাকোটকে স্পর্শ করেছিলো। তীতুর বাঁশের কেল্লা – মুহাম্মদী আন্দোলন, ফারাইজীদের জেহাদকে সামগ্রিকভাবে অর্থবহ করে তুলেছিল।

ফিলিস্তিন উদ্ধার, বায়তুল মোকাদ্দাস দলখলমুক্ত করতে বাংলার বহু দামাল ছেলে প্রত্যক্ষ জেহাদের ময়দানে শাহাদাতবরণ করেছে। কারণ ঈমান ও ঈমানদারের কোন নির্ধারিত ভূখণ্ড নেই। আল্লাহ্‌ জমিনের যেখানেই দ্বীনের আওয়াজ উঠবে, যেদিক থেকেই জিহাদের ডাক আসবে, মুমিন-মুজাহিদ হাজির হবে। যার যা আছে সবটুকু পূজিকে বিনিয়োগ করবে জেহাদের জন্য।

রুশ প্রেসিডেন্ট পুটিন যখন এ যুগের আবরাহার মত দম্ভ করে বলেন, চেচনিয়া থেকে আর সৈন্য সরবে না, সেই সাথে কম্পিত হৃদয়ে এই কথা বলতে বাধ্য হন ১৯৯৫-৯৬ সালে সৈন্য প্রত্যাহার ভুল হয়েছিল। আবার এই কথাও বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতে বাধ্য হন, আজ তাদের সামনে খোলা পথ দু'টো। হয় বিপ্লবী চেচেনদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া, স্বাধীনতার স্বপ্ন-সাদ গুড়িয়ে দেয়া, নয়তো চেচনিয়াকে চেচেনদের হাতে রেখে রুশ সৈন্যের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

কথিত সেই বিশ্ববিবেক যাই ভাবুক, তাবেদার মুসলিম শাসকরা যাই বলুক, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি, চেচেনদের সামনে এখন আর কোন বিকল্প পথের সন্ধান নেই। আছে মাত্র একটি পথ। জিহাদের পথে আজাদী, মুক্তি, দ্বীনের বিজয় ঘোষণা। ইনশাআল্লাহ্‌ বিশ্ববাসীকে অবাক করে আল্লাহ্‌র সৈনিকরা সেই বিজয়ের ডংকা অচিরেই বাজাবে। আমরা যারা কোন না কোন বাহানায় মুখ ফিরিয়ে রাখবো, তারা প্রতারিত হবো নিজেদের কাছে, প্রবঞ্চিত হবো সময়ের কাছে। কারণ জিহাদের পথে হারাবার কিছুই নেই। বিজয় যেমন আল্লাহ্‌র সেরা দান, তেমনি শাহাদাতও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। বদর-ওহুদ-খন্দক-খায়বরের পথ ধরে মিল্লাতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর উত্তরসূরিরা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর উম্মতরা যখন সামনে কদম ফেলে তখন পেছনের কদম মাটি থেকে যেই না আলগা করে নেয়, তখন সে শুধু সামনে বাড়ায়, আর পেছনে তাকায় না, সেই কদম সামনে ছাড়া আর পেছনের মাটি স্পর্শ করে না। চেচেনদের অগ্রাভিযান সাময়িক হয়তো বাঁক ঘুরবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র এই সৈনিকদের গতিরোধ করে এই সাধ্য কারো নেই।

এমনও হতে পারে, বস্তুবাদী সভ্যতা নামক বন্য সংস্কৃতির ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াবে চিরায়ত সত্য-সুন্দরের অনুপম আদর্শ ইসলাম-চেচনিয়া হবে এর অন্যতম পশ্চাৎভূমি। ইউরোপের ভাঁড় ইয়েলৎসিনের উত্তরাধিকার পুটিনের দম্ভ-অহংকার হয়তো বিধ্বস্ত করে দেবে চেচনিয়াকে, কিন্তু সেই বিধ্বস্ত-বিরাণ জনপদ থেকে বিপ্লবের যে বৃক্ষ গজিয়ে উঠবে, সেটি হবে রুশ সাম্রাজ্যের শেষ ধ্বংস তিলক এবং কমিউনিজমের আত্মাহীন দেহে শেষ পেরেকটির উপর কালেমার হাতুড়ীর শেষ আঘাত।

তথ্যসূত্র ঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম

কৃতজ্ঞ ঃ বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল লেখকের প্রতি

তালেবান পরিক্রমা

মুসলিম বিশ্বের প্রতি মোল্লা ওমর এর আহ্বান নির্যাতিত চেচেন মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন

দখলদার রুশ বাহিনীর আফগান ত্যাগের একাদশ বর্ষপূর্তিতে জনগণের উদ্দেশে প্রদত্ত এক বাণীতে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর বলেছেন, বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাশিয়া আফগানিস্তান অনুপ্রবেশ করেছিল এবং দশটি বছর আফগান জনগণের উপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালিয়েছিল। যার ফলে আফগানিস্তানের পনের লাখ মানুষ শহীদ হয়। আহত হয় দশলাখ নিরপরাধ আফগানী। মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র হিজরত করে কত মানুষ তার কোন হিসেব নেই। কিন্তু অবশেষে রাশিয়া এ দিনে, এই তারিখে অপদস্ত হয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। মুজাহিদদের জবাবদিহি প্রতিরোধের মুখে রাশিয়া শুধু আফগানিস্তান ত্যাগ করতেই বাধ্য হয়নি- নিজের সাম্রাজ্যও তার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে। রাশিয়ার দখলমুক্ত হওয়ার পর আফগানিস্তানে মুজাহিদদের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এদেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত। এমতাবস্থায় আমেরিকার উচিত ছিল, দশ বছরের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্য সর্বাত্মক সাহায্য করা। কিন্তু উল্টো সে দেশটির উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে বসে আছে।

বিবৃতিতে মোল্লা ওমর বলেন, আফগান জনগণের জানা দরকার যে, আমেরিকা কখনোও চায় না যে, আমরা আমাদের দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করি এবং আমরা ইসলামী জীবন যাপন করি। আফগান জনগণের এ-ও জানা থাকা দরকার যে, প্রথমদিকে আমেরিকা মুজাহিদদের যে সাহায্য দিয়েছিল, তার লক্ষ্য আফগান মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা ছিল না। আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা।

পরিশেষে মোল্লা ওমর বলেন, আজ চেচেন মুসলমানরাও আফগানীদের বর্বর রাশিয়ার অমানবিক নির্যাতনের শিকার। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি আমার আকুল আবেদন, গোপনে হোক, প্রকাশ্যে হোক, আপনারা মজলুম চেচেন মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন।

তালেবান নিজেকে শাসক নয়- দেশের সেবক মনে করে
- মৌলভী আখতার ওসমানী

কান্দাহার কোর কমান্ডার মৌলভী আখতার ওসমানী এক জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে বলেন, তালেবান নিজেকে দেশের শাসক নয়- সেবক মনে করে এবং সে মতেই নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ইমারাতে ইসলামিয়া সেই প্রথম দিন থেকেই মজলুমের উপর জালিমের জুলুম প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। মৌলভী আখতার বলেন, দেশে-বিদেশে যারা তালেবানের দুর্নাম রটাচ্ছে, তারা মিথ্যা প্রচারণা করছে। তিনি ভাষণে বহিঃর্বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি ইসলাম বিরোধীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান।

তালেবানের উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ কোনড় প্রদেশে গরীবদের জন্য চার কক্ষ বিশিষ্ট তিনশত গৃহ নির্মাণ কাজ শুরু

আফগানিস্তানের তালেবান সরকার দেশের গরীব-নিঃস্ব লোকদের আশ্রয়ণ কার্যক্রম শুরু করেছে। একটি বিদেশী সেবা সংস্থার সহযোগিতায় কোনড় প্রদেশে ৩০০ ঘর নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। প্রতিটি ঘর চার কক্ষ বিশিষ্ট। শহীদ ও মুহাজির মন্ত্রণালয় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখিত সেবা সংস্থাটি শহীদ ও মুহাজির পরিবারের জন্য আরো বেশ কিছু ঘর নির্মাণ কাজে সহায়তা দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।

ফারিয়াব ঃ দাঁতের বদলে এক ব্যক্তির দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে

আফগানিস্তানের ফারিয়াব প্রদেশে এক আসামীর উপর কিসাসের শরয়ী বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে। খবরে প্রকাশ, গোলাম মহিউদ্দিন নামক এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিল। ভিকটিম আদালতে গোলাম মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। তালেবান পুলিশ আসামীকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে। সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিম্ন আদালত কিয়াসের বিধান অনুযায়ী আসামীর দাঁত ভেঙ্গে দেয়ার রায় প্রদান করে। অতঃপর উচ্চ আদালতের অনুমোদিত হলে হাজার হাজার মানুষের সামনে রায়টি কার্যকর করা হয়।

সারেপুল ঃ বিরোধী কমান্ডারের অস্ত্রসমর্পণ

সারেপুল প্রদেশের কোহেস্তান জেলায় হাজী আব্দুল হামীদ নামক এক বিদ্রোহী কমান্ডার ৩০ সহযোগী সহ ইমারাতে ইসলামিয়ার মুজাহিদদের হাতে অস্ত্র সমর্পণ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। অস্ত্র সমর্পণের সময় কমান্ডার আব্দুল হামীদ অঙ্গীকার করেছেন, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকবেন।

জুমার খোতবায় মোল্লা মোহাম্মদ রব্বানীর দৃপ্ত ঘোষণা ইমারাতে ইসলামিয়া কখনো জিহাদ ত্যাগ করবে না

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোল্লা মোহাম্মদ রব্বানী বলেছেন, ইমারাতে ইসলামিয়া কখনো ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ত্যাগ করবে না। তিনি বলেন নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।' আমরা জিহাদ ত্যাগ করে নবীজি (সাঃ)-এর এ ঘোষণার বিপরীতে অবস্থান নিতে পারি না। আমরা কুফর ও শিরকের বিরুদ্ধে জিহাদ করে নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব পালন করতে চাই। কাবুলের উজীর আকবর খান জামে মসজিদে এক জুমার খোতবায় তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, সম্পদ ও সন্তান পরীক্ষার বস্তু। কাজেই এগুলোকে আল্লাহরই পথে ব্যয় করা উচিত। বিরোধী দলগুলো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারো বৈধ অধিকার নেই। তালেবান এখন আফগানিস্তানের প্রতিষ্ঠিত সরকার। বিরোধী পক্ষগুলো শুধু ক্ষমতার মোহে লড়াই করছে। তিনি বলেন, বিরোধীরা যতক্ষণ না আমীরুল মুমিনীনের আনুগত্য মেনে নিয়ে নিজেদের অতীত অপকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করার ঘোষণা দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষমা নেই। তওবা না করলে তাদের পাহাড়ে-জঙ্গলেই ঘুরে মরতে হবে।

আফগানিস্তানের ব্যাপারে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের সাম্প্রতিক এক মন্তব্য প্রসঙ্গে মোল্লা রব্বানী বলেন, কফি আনানকে আমাদের বিরোধী পক্ষগুলোর প্রতিনিধি বলে মনে হচ্ছে। অথচ তার উচিত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা।

মোল্লা আব্দুল হাই মোতমাইন বললেন
টিভি সম্পর্কে আলোচনা করা সময় নষ্ট করার ছাড়া কিছু নয়

সংস্কৃতি মন্ত্রী মোল্লা আব্দুল হাই মোতমাইন বলেছেন, আমাদের রাষ্ট্রনীতি আখলাক ও ইসলামী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা কোনক্রমেই এমন পদক্ষেপ নিতে পারি না, যাতে আমাদের ইসলামী ও আখলাকী পরিকল্পনায় আঘাত লাগে। সম্প্রতি বিবিসি পশ্‌তু প্রোগ্রামে টিভি বিষয়ক এক আলোচনায় তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচনায় মোল্লা আব্দুল হাই বলেন, ইমারাতে ইসলামিয়ার সামনে টিভি অপেক্ষা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ পড়ে আছে। তন্মধ্যে সমাজকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং দেশের জনসাধারণের নানাবিধ সামাজিক সমস্যার সমাধান দেয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, টিভি একটি 'নন ইস্যু' যাকে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো 'ইস্যু' বানাবার চেষ্টা করছে।

বিবিসির প্রতিবেদকের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন ছুড়েন যে, বিশ মিলিয়ন আফগানীর মধ্যে উনিশ মিলিয়নেরও বেশী মানুষ এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ পায়নি। এমতাবস্থায় সরকার অনুমতি দিলেও তারা টিভি দেখবে কি দিয়ে? তিনি বলেন, এ ধরনের গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

কাপিসা ঃ ১২ বিরোধী কমান্ডারের আত্মসমর্পণ ঃ বিস্তীর্ণ এলাকা তালেবানের হাতে হস্তান্তর

কাপিসা প্রদেশে ১২ জন বিরোধী কমান্ডার অস্ত্র সমর্পণ করে বিস্তীর্ণ এলাকা তালেবানের হাতে তুলে দিয়েছে। খবরে প্রকাশ, কমান্ডার শাকেরুল্লাহ কমান্ডার মোহাম্মদ সরওয়ার সহ এলাকার নামকরা ১২ জন কমান্ডার তালেবানের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে দোররা মাকীন ও সাইয়েদাবাদের বিস্তীর্ণ এক এলাকা তালেবানের হাতে তুলে দিয়ে শত্রুপক্ষের স্বপ্নসাধ ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

অপর এক খবরে জানা গেছে, বাগলাম প্রদেশের আন্দ্রাব জেলায় বিশিষ্ট বিরোধী কমান্ডার মোহাম্মদ নাসিম ২০০ সহকর্মীসহ তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মোহাম্মদ নাসিম মাসউদ বাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার ছিলেন। আত্মসমর্পণের পর তিনি আহমদ শাহ মাসউদদের অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন। তিনি আমৃত্যু ইমারাতে ইসলামিয়ার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সন্ত্রাস মোকাবেলায় কমিশন গঠন

আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশটিতে সন্ত্রাস মোকাবেলা করতে একটি কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছে। তালেবান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে তা নির্মূল করার অঙ্গীকার করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, "আমরা আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অবহিত। আমরা জেহাদকে সমর্থন করি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে নয়।" বিবৃতিতে নয়া কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে এতে শুধু বলা হয়েছে, সন্ত্রাস মোকাবেলায় প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে যৌথ কৌশল প্রণয়ন করা হবে। প্রতেবিশী পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফ সর্বোচ্চ তালেবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরসহ তালেবান কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের জন্য আফগানিস্তান সফরের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। এই সফরের তারিখ এখনো নির্ধারণ করা হয়নি।

বৃষ্টির জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত কামনা

আফগানিস্তানের জনগণ শুষ্ক আবহাওয়ার তীব্রতা থেকে রেহাই পেতে সম্প্রতি দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহারে আল্লাহর রহমত কামনা করে বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেয়। গ্রীষ্মের খরায় আফগানিস্তানে খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়েছে এবং প্রচুর গবাদিপশু মারা গেছে। তালেবান কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের আহ্বানে কান্দাহারের মসজিদগুলোতে সর্বস্তরের জনগণ এ প্রার্থনায় শরীক হয়। আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াকিল আহমেদ মুতাওয়াক্কিল বলেন, আমাদের খাদ্যশস্য, ফলবাগান এবং গবাদিপশুর জন্য পানি খুবই প্রয়োজন। উল্লেখ্য, আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকরা পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের অভাবে বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভর করে। গত জানুয়ারীতে আফগানিস্তানের ধর্মভীরু জনগণ একইভাবে বৃষ্টির জন্য তিনদিন ধরে প্রার্থনা করে। সে প্রার্থনায় ফল হয় এবং খরার অবসান ঘটে।

সূত্র ঃ জরবে মুমিন, করাচী

লাহোর থেকে কান্দাহার

সৈয়দ মবনু

পাকিস্তানের জন্মের সময় এ গ্রহে আমার অস্তিত্ব-ই ছিল না। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ হওয়ার সময় আমার বয়স মাত্র এক বছর। দেখিনি ইতিহাসের এই পর্ব। আমাদের প্রজন্মের ছেলেরা আজ বিভ্রান্ত ইতিহাসের এই পর্ব নিয়ে। ভারত কেন্দ্রিকতার স্পর্শে ১৯৭১ সালের পর আমাদের ইতিহাস অস্পষ্ট। আমরা জানি পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল কালেমার স্লোগানে। বলা হতো, "পাকিস্তান কা মতলব কেয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"। আবার আমরা জানলাম, পাকিস্তানী মুসলমানেরা ইসলামের নাম নিয়ে বাংলার মুসলমানদের উপর নির্যাতনের সর্বপ্রকার স্টীমরোলার চালালো, মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করলো। লুটে-পুটে নিয়ে গেলো ধন-জন-ইজ্জত। কেন? তারা এমন করলো কেন? আমরা কি অপরাধ করেছি তাদের কাছে? তবে তারা কি আমাদেরকে মুসলমান মন করে না? না এটা ছিল নেতৃত্বের লড়াই? হতে পারে। আওয়ামী লীগ ও পিপল্‌স পার্টি দু'টি-ই কিন্তু সেক্যুলার সংগঠন। ওদের মাধ্যমে ইসলাম আসতে পারে না। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ কি জানে, ১৯৭১ সালে বাংলার মুসলমানদের উপর তারা কি নির্যাতন করেছিল?

পাকিস্তানের সাথে, পাকিস্তানের জন্মের সাথে বাংগালী মুসলমানদের একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দুদের বড় অংশই ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে। বিশেষ একটি অংশ ছিল বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত। ওদের সাথে মুসলমানদের হৃদয়ের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে তাও ভেঙ্গে গেল। ইংরেজরা যেহেতু মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের ক্ষমতা অবৈধভাবে দখল করেছে, তাই তাদের সংঘাতটা মুসলমানদের সাথেই বেশি ছিল। হিন্দুরা এটাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছে। তাদের মধ্যে যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, তারা খুব সচেতন ছিল, যাতে মুসলমানরা ক্ষমতা ফিরে না পায়। হিন্দুদের এই ষড়যন্ত্রের নীল নক্‌শা মুসলমানেরা প্রত্যক্ষ করল বিশ শতকের শুরুতে। ভারতের বড় লর্ড কারজনের সময় প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৯০৫ সালে উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে আসামের সাথে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। এই প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় করে এখানে একটি আইনসভাও প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের হিন্দু মহোদয়গণ তা মেনে নিতে পারলেন না। তারা জানতেন, যদি ঢাকা একটি প্রদেশের রাজধানী হয়ে যায়, তবে মুসলমানরা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যাবে। তাই তারা বঙ্গ ভঙ্গ রদ আন্দোলন শুরু করলেন। এই আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গ বিভাগ রদের সুপারিশ করেন। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহুত দিল্লীর দরবারে বঙ্গ ভঙ্গ রদের ঘোষণা করা হয়। এরপর মুসলমানরা স্পষ্ট বুঝে ফেলেন যে, এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম নামক ইংরেজের হাতে ১৮৮৫ সালে জন্ম নেওয়া কংগ্রেসও মুসলমানদের শত্রু। ইংরেজরা চাচ্ছে তাদের পর ভারতবর্ষে হিন্দুদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে। এই উদ্দেশ্যেই তারা কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছে। কংগ্রেসের সাথে মুসলমানদের সহাবস্থান চলবে না। কংগ্রেসের মাধ্যমে মুসলমানদের কোন অধিকার আদায় হবে না। তাই ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে নবাব সলিমুল্লাহ্‌র প্রস্তাব অনুসারে সর্বসম্মতিক্রমে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত এই মুসলিম লীগের আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তানের জন্ম।

মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির স্বপ্নদ্রষ্টা বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক কবিসম্রাট ডঃ আল্লামা ইকবাল। ১৯৩০ সালে তিনি এক বক্তব্যে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রস্তাব করেন। পরে ১৯৩৩ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলোর জন্য 'পাকিস্তান' নামের উদ্ভাবন করেন। এরপর আন্দোলন, নির্বাচন, রক্তপাতের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের জন্ম। এই পাকিস্তান কিংবা পাকিস্তানের চিন্তাই আসতো না, যদি বাংলার কৃতিসন্তান নবাব সলিমুল্লাহ মুসলিম লীগ গঠনের প্রস্তাব না করতেন। যদি শেরে বাংলা ফজলুল হক ১৯৪০-এর লাহোর অধিবেশনে ঐতিহাসিক প্রস্তাব না করতেন, তবে ভারতবর্ষে পাকিস্তান আন্দোলন গর্জে উঠতো না। যদি ১৯৪৬ সলে বাংলার মুসলমানরা মুসলিম লীগকে নির্বাচনে ভোট দিয়ে বিজয়ী না করতো, তবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র বাস্তবে রূপ নিতো না। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের বিজয়ের জন্য যদি বাংলার মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরায়ার্দী চেষ্টা না করতেন, তবে কি জিন্নাহ-লিয়াকত আলীরা বিজয়ের মালা গলায় দিয়ে মুচকি হাসি হাসতে পারতেন? এখন প্রশ্ন হলো যে, বাংগালী মুসলমানেরা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম দিলো তারাই আবার কেন ভাংতে গেল?

এইসব প্রশ্ন আমার কিংবা আমাদের প্রজন্মের অনেকের। এই প্রশ্নগুলোকে সামনে নিয়েই দীর্ঘদিন থেকে ভাবছি পাকিস্তান সফরে যাবো। শেষ পর্যন্ত আমি, আমার বন্ধু আবু উমর মোহাম্মদ মোস্তফা এবং আবুল কাসেম সিদ্ধান্ত নিলাম পাকিস্তান সফরের।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ইংরেজী সকাল ৯টায় আমরা বার্মিংহ্যাম এয়ারপোর্ট থেকে কে.এল.এম বিমানে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। হল্যান্ডের আমস্টারডাম বিমানবন্দর থেকে কে.এল.এম-০৪৪৯ ফ্লাইট আমাদেরকে নিয়ে এই দিন দুপুর ১টায় করাচীর পথে যাত্রা শুরু করে।

করাচী এয়ারপোর্ট

আট ঘণ্টা চলার পর বিমান আকাশের কালো মেঘ ঠেলে নিচের দিকে যেতে লাগলো। যেতে যেতে একসময় সে তর্জনী দিয়ে দু'পা মাটিতে রাখলো। এরপরই এলিয়ে দিলো সমস্ত শরীর। সবার মধ্যে চঞ্চল ভাব। অদৃশ্য থেকে কণ্ঠ ভেসে এলো, "সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ! আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের প্লেন এইমাত্র করাচী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। আগামীতে আবারও দেখা হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে জানাচ্ছি যে, আপনাদের ভ্রমণ শুভ হোক।" কর্তৃপক্ষের এই আশির্বাদ বাণীটি ডাচ, ইংরেজী ও উর্দুতে প্রচার করা হলো। উর্দু ভাষায় আনাড়ী একটা লোক এখানে

উর্দু বলেছে। বিদেশী বিমানে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এই অসহ্য জিনিষটা মাঝে মধ্যে সহ্য করতে হয়। আমরা এতো টাকা দিয়ে তাদের সাথে ভ্রমণ করি তারা কি আমাদের স্বার্থে এজন প্রকৃত বাংলাদেশীকে চাকুরী দিতে পারে না? কে.এল.এম-০৪৪৯ তার নির্ধারিত গেইটে থামলো। করাচী বিমানবন্দর (যাকে উর্দু ভাষায় হাওয়াই আড্ডাখানা বলে) এর আন্তর্জাতিক কাস্টম লাউঞ্জেও পা দিতেই স্মরণ হলো আমার সোনার বাংলার জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কালচার। না, কোন ব্যবধান নেই। দালালরা এখানেও আছে। আমাদেরকে দালালদের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। ইমিগ্রেশন লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় তারা জানতে চাইলেন, "স্যার! মাল তো জিয়াদা নেহি, আগার চাহে তো হাম মদদ কর ছেকতে?" একজন নয়, এক এক করে পাঁচজন একই কথা বললেন। অবশেষে একজনকে আমার অসহ্যের কথা জানিয়েই দিলাম। এর পর আর কেউ আসেনি। পানির মত পরিষ্কার আমাদের সব কিছু। দালালের কি প্রয়োজন? ইমিগ্রেশন শেষে বেরিয়ে দেখি খলিল দাঁড়িয়ে। বার্মিংহামের লোক। লেখাপড়া করে করাচিতে। তার সাথে টেলিফোনে আগে যোগাযোগ হয়েছে। একশত রুপি দিয়ে গাড়ি ভাড়া করা হলো। মালপত্রসহ আমরা গাড়িতে উঠলাম। ড্রাইভার পুলিশকে সেলামি দিয়ে যাত্রা শুরু করলো।

খলিলের ফ্লাট

গাড়ি এসে থামলো গুরু মন্দির কলোনিতে। দেখতে প্রায় আজিমপুর কলোনির মতো। ভাড়া পরিশোধ করে আমরা হাঁটতে শুরু করি। সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে উঠতে প্রায় ক্লান্ত হয়ে গেলাম। পাঁচ তালার উপর খলিলের ফ্লাট। উঠতে একটু কষ্ট হলেও ফ্লাটের পরিবেশ খুব আরামদায়ক। খলিলের সাথী মাওলানা শামীম আমাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা সবাই খুব মজা করে খেলাম। এখন ঘুমানোর পালা। রুমে ফ্যান থাকলেও আমরা ব্যবহার করিনি। শত গরম হলেও ফ্যান চালিয়ে ঘুমাতে আমার অসহ্য লাগে। জানালা খোলা। তাই খুব আরামদায়ক কুদরতি বাতাস আসছিলো। একটু আয়েশ করেই ঘুমালাম।

ফজরে ঘুম ভাংলো চারিদিকে আজানের ধ্বনি শোনে। শয়তান এসে বিছানা গরম করছে যাতে না উঠি। ইস্তেগফার করতে করতে উঠে গেলাম। অজু করে নামাজ পড়ে কোরআন তেলাওয়াতে বসলাম। দীর্ঘদিন পর সকালের কোরআন তেলাওয়াতের সাথে কাকের কা-কা, কাক-চড়ুই-এর কিচির মিচির শুনতে খুব মধুর লাগছে। বৃটেনে সাধারণত এমন পরিবেশ পাওয়া খুব দুষ্কর। তেলাওয়াত শেষে খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

এক রাশ মুক্ত বাতাস এসে শরীরে লাগলো। এই ফ্লাট শহর থেকে অনেক উঁচুতে হওয়ায় বাতাসে শহরের কোলাহলের স্পর্শ নেই। করাচী আরব সাগরের তীরে অবস্থিত। এক সময় এটি পাকিস্তানের রাজধানী ছিল। পরে তা পরিবর্তন করে ইসলামাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তানের বিশিষ্ট রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ডঃ ইসরার আহমদের মতে পাকিস্তান ভাঙ্গার কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে রাজধানী পরিবর্তন।

(নেদায়ে খিলাফত, ডিসেম্বর ১৯৯৬ সংখ্যা)

করাচী শহরের ভেতরে প্রবেশ করলে বুঝাই যায় না যে, এটা সাগর-তীরের শহর। তবে খলিলের ফ্লাট থেকে কিছুটা অনুভব করা যায়। বাতাসে একটু একটু ঠান্ডা লাগছে। খলিলের ফ্লাটে সবচাইতে আকর্ষণীয় হলো কলিং বেল। টিপ দিলেই বলে উঠে-"আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"।

মুফতি জাকির ও তার সাথীদের সাথে পরিচয়

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ভুলে গেলাম নিজের অবস্থান। এর মধ্যে কে কলিং বেলে টিপ দিলো। দু'তিনজন এক সাথে প্রবেশ করলেন। বাংলায় কথা বলছেন, বুঝলাম, তারা বাঙালী। পরে বুঝলাম, তারা এসেছেন আমাদের সাথে দেখা করতে। তিনজনের একজন হলেন মুফতি জাকির। তিনি করাচীর সুপরিচিত একজন বাঙালী আলেম। নাজিমাবাদের মাদ্রাসায়ে ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল। তাঁর সাথে রয়েছেন মাওলানা আব্দুর রহমান ও মাওলানা সিদ্দিকে আকবর। তারাও বর্তমানে করাচীর অধিবাসী। তাদের কারো সাথেই আমার পূর্ব পরিচয় নেই। আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারলাম, তারা ইতিপূর্বে আমার লেখার সাথে পরিচিত। দীর্ঘ সময় তাদের সাথে আলোচনা হলো। বিদায়ের বেলা মুফতি জাকির ভাই তার মাদ্রাসায় দাওয়াত করে গেলেন।

জাকির ভাইয়ের মাদ্রাসা ও রশিদ ট্রাস্টের মসজিদ

পাকিস্তানের এক এক কলোনী বিরাট বিরাট এলাকা নিয়ে। মুজাহিদ কলোনী নাম শুনে কেউ ভয় পেয়ে যেতে পারেন তবে ভয়ের কিছু নেই। নামে মুজাহিদ কলোনী হলেও এটি একটি সাধারণ মহল্লা। আসরের নামাজের সময় আমরা মুজাহিদ কলোনীতে পৌঁছি। চার নম্বর মুজাহিদ কলোনী, নাজিমাবাদ হলো জাকির ভাইয়ের ইসলামিয়া মাদ্রাসা। মাদ্রাসার পাশেই রশিদ ট্রাস্ট। এটা মুফতি রশিদ আহমদ সাহেবের নামানুসারে। এই ট্রাস্টে রয়েছে মাদ্রাসা, মসজিদ, দারুল ইফতা। 'জরবে মুমিন' নামক একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয় এখান থেকে। মুফতি রশিদ আহমদ বর্তমান পাকিস্তানের একজন বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞ আলেম। মাওলানা সিদ্দিকে আকবর আমাকে রশিদ ট্রাস্টের মসজিদে আসরের নামাজ পড়তে নিয়ে গেলেন।

এক আজিব অবস্থা। মসজিদের গেইটের দু'পাশে দু'টি সামরিক চৌকি। পাকিস্তানে অবস্থানকালে আমি যে দিনই যে মুহূর্তে সে দিকে এই চৌকির ছিদ্রগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছি, তখনই দেখেছি দু'একটা মানুষের চোখ। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত সতর্ক পাহারা চলছে। এছাড়া মসজিদের গেইটের বাইরে একজন এবং ভেতরে একজন ক্লাশিনকভ নিয়ে দাঁড়িয়ে। অপর একজন প্রবেশরত মুসল্লীদেরকে তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করছেন। আমরা সকল ঝামেলা শেষে ভেতরে গেলাম। জামাত শুরু হওয়ার দু'এক মিনিট পূর্বে আরেকজন ক্লাশিনকভ নিয়ে মসজিদের আঙ্গিনার দিকে প্রবেশ করলেন। খুব সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখলেন। চলে গেলেন। কিছু সময় পর ইমাম সাহেবকে সাথে নিয়ে আবার ফিরে এলেন। এই ইমাম সাহেবই হচ্ছেন মুফতি রশিদ আহমদ। জামাত শুরু হলো। মসজিদের মিম্বরের উপর ক্লাসিনকভ হাতে একজন দাঁড়িয়ে রইলেন। হয়তো তিনি আগে নামাজ পড়ে নিয়েছেন। অথবা পরে পড়বেন। যদি সাথী আগে আমায় এসব দৃশ্যের কথা না বলতেন, তবে হয়তো কিছুটা ভয়ই পেতাম। তবে দৃশ্যটা খুবই অসহ্যকর। যুদ্ধের ময়দান কিংবা ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, ভারত হলে তা মেনে নেওয়া যেত। পাকিস্তানের মতো একটি মুসলিম দেশ, যার জন্ম ইসলামের ভিত্তিতে সেখানে এই দৃশ্য কষ্টদায়ক। এটা

হয়েছে শিয়া-সুন্নী সংঘাতের কারণে। বছর দু'য়ে আগে শিয়ারা এই মসজিদে ব্রাশ ফায়ার করে সেজদারত পাঁচ-ছয়জন মুসল্লীকে শহীদ করে দিয়েছিল। তাই মসজিদ কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছেন। শিয়াদের ভয়ে শুধু এই মসজিদ-মাদ্রাসাই নয় বরং গোটা পাকিস্তানের সকল মসজিদ-মাদ্রাসায় কমবেশি এমন অবস্থা। আসরের নামাজ পড়ে আমরা ইসলামিয়া মাদ্রাসায় চলে আসি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল মুফতি জাকির। শিক্ষকের মধ্যে বাঙালী, পাকিস্তানী, পাঠান রয়েছেন। ছাত্রদের অনেকেই বাঙালী। প্রায় তিন-সাড়ে তিনশ' ছাত্র এই মাদ্রাসায়। সবার জন্য ফ্রি লেখাপড়া এবং থাকা-খাওয়া। মুফতি জকির সাহেব আমাদের জন্য খুব সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করেন।

করাচীর বাঙালী

করাচীতে যে এত বাঙালীর বসবাস তা আমার আগে জানা ছিল না। ইংল্যান্ডের বাঙালীদের মত করাচীর বাঙালীরা প্রায় স্থায়ী হয়ে গেছেন। সেখানে বয়স্করা ভালোভাবে বাংলায় কথা বলতে পারলেও নতুন প্রজন্ম উর্দু মিশিয়ে বাংলাকে খিচুড়ি করে ফেলে। নতুন প্রজন্মের বাঙালীকে পাকিস্তানে ঠাট্টা করে 'ফটোস্ট্যাট বাঙালী' বলা হয়। বিশেষনটা আমার কাছে এক প্রকারের গালি মনে হয়েছে। যাদেরকে সম্ভব হয়েছে নিষেধ করেছি এমন শব্দ ব্যবহার করতে। ওদের পরিচিতি হতে পারে 'পাকিস্তানী বাঙালী'।

জাকির ভাইয়ের মাদ্রাসায় খাওয়া-দাওয়া করে বিদায় নিলাম। মাওলানা শামীমকে নিয়ে তিন হাট্টি বাঙালী কলোনীতে গেলা। টেক্সি থেকে নেমে বস্তির ভেতরে যাওয়ার পথেই দেখা হলো মাওলানা ইউনুসের সাথে। তিনি স্থানীয় বাঙালী মসজিদের ইমাম। মাওলানা শামীমের সাথে পূর্ব পরিচিত। আমাদের পরিচয় দেয়া হলো। হুজরাখানায় (ইমাম সাহেবের ঘর) আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো। কিছু সময়ের মধ্যে বেশ কিছু বাঙালী সমবেত হয়ে গেল।

তাদের কাছে জানতে চাইলাম, করাচীতে আপনারা কিভাবে অবস্থান করছেন?

তাদের মধ্যে সবচাইতে যিনি বয়স্ক তিনি উত্তর দিলেন, আমাদের অনেকই এসেছে ত্রিশ-চল্লিশ বছর পূর্বে। তখন বাংলাদেশ পাকিস্তান এক ছিল। আর অনেকে এসেছে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে। এখানে সরকারীভাবে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত অনেকে দেশ থেকে পরিবার নিয়ে এসেছে। এরপর আস্তে আস্তে সরকারী খাস জমির উপর বাড়ী ঘর তৈরী করে বস্তির পর বস্তি গড়ে উঠেছে। করাচীতে প্রচুর বাঙালী বস্তি রয়েছে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী গোটা পাকিস্তানের কয়েক লাখ বাঙালী রয়েছে। মুসলিম লীগ সরকার ওদের কতিপয়কে সনাক্তি কার্ড অর্থাৎ নাগরিকত্ব এবং কতিপয়কে কাজের অনুমতিক্রমে সেটেল করার চিন্তা করছিল। অবশ্য আমাদের পুরাতন অনেকেরই সনাক্তি কার্ড আছে। তা ছাড়া এখানে ছাত্র ভিসায় প্রচুর বাঙালী আছেন।

ঃ সরকারের এই উদ্যোগে আপনারা কতটুকু খুশি?

ঃ হ্যাঁ! আমরাও চাই এমন একটা কিছু হোক।

জানতে চাইলাম, পাকিস্তানের সরকার ও সাধারণ মানুষ বাঙালীদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করে?

তাদের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিলেন, বর্তমান সরকারের ব্যবহার ভালো। বেনজির ভূট্টোর দল ক্ষমতায় গেলে বাঙালীদের খুব নির্যাতন করে। বর্তমানে আমাদেরকে পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে। বেনজির ভূট্টোর সময় বাঙালীদেরকে পিপলস্ পার্টি ও আলতাফ হোসেনের কওমী মুহাজির দলের কর্মীদের সাথে পুলিশও নির্যাতন করতো। ১৯৭১-এর হিংসায় ভুট্টোর দল বাঙালীদেরকে সহ্যই করতে পারে না। নওয়াজ শরীফ ক্ষমতায় আসার পর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মুসলিম লীগ সর্বদাই বাঙালীদেরকে সমিহ করে। মাঝে-মধ্যে দু' একজন ছাড়া এবং পিপলস্ পার্টির কর্মী ও নেতারা ছাড়া বাকি মানুষদের স্পষ্ট বক্তব্য যে, দুই নেতায় ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধ করে পাকিস্তান ভেঙ্গেছে। সাধারণ মানুষের কোন দোষ নেই। সৈন্যরা যে নির্যাতন করেছে, তা অন্যায়। তাছাড়া যাদের মধ্যে ইসলামী অনুভূতি আছে, তারা মনে করে, বাঙালী পাকিস্তানী বড় কথা নয়। আমরা সবাই মুসলমান। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের উভয় অংশে যারা নেতৃত্বে ছিল তাদের বেশির ভাগ ছিল ধর্মীয় অনুভূতিহীন।

ঃ আলতাফ হোসেন মোহাজিরদের নেতা। আর আপনারা মুহাজির। সমস্যাটা কোথায়?

ঃ আলতাফ হোসেন চাপাবাজ ও সন্ত্রাসী। মোহাজিরদের নাম ভাঙ্গিয়ে সে ও তার দলের লোকেরা মাস্তানী এবং আয়েশ-বিলাস করে। সে চেয়েছিল আমরা তাকে সমর্থন করি। আমরা করিনি। বাস্তবে কোন ভাল লোক তাকে সমর্থন করতে পারে না। তাই সে নারাজ। আপনাদের ইমেগ্রেশন অবস্থা কি?

ঃ আমাদের অনেকের সনাক্তি কার্ড আছে। আবার অনেকের নেই। মুহাজির কওমী দলও বিহারীদের সংগঠন। তারা চায় আমরা বাংলাদেশে চলে যাই। আর বাংলাদেশ থেকে বিহারীরা ফিরে আসুক। এ নিয়ে আগে হাঙ্গামা হতো প্রায়। বর্তমানে দেশে ফৌজী শাসন (সামরিক শাসন) চলছে, তাই অবস্থা এখন শান্ত।

ঃ শুনলাম এখানে পাকিস্তানীরা বাঙালীদেরকে কাজ করিয়ে পয়সা দেয় না। তা কি সত্য?

ঃ এমন ঘটনা আমাদের জানা নেই। তাছাড়া বর্তমান জামানা সিয়াসতের (অর্থাৎ রাজনীতি)। সিয়াসতের কারণে মানুষ তিলকে তাল করে। বাংলাদেশ কি এমন ঘটনা নেই যে, কাজ করিয়ে পয়সা দেয় না, হাইজ্যাক করে সব নিয়ে যায়?

ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ হলো করাচীর বাঙালী মহিলারা বেশির ভাগ দেহ ব্যবসার সাথে জড়িত। এখানে নাকি প্রকাশ্যে বাঙালী নারী ক্রয়-বিক্রয় হয়। এসব কি সত্য?

ঃ এসব ডাহা মিথ্যা কথা।

বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ কিংবা ইংলিশ রোড গিয়ে যদি কেউ বলে, বাংলাদেশে বেশির ভাগ মহিলা পতিতা, তবে কি সত্য হবে?

শয়তানী সব স্থানেই কমবেশি আছে। তবে নারায়ণগঞ্জ বা ইংলিশ রোডের মতো প্রকাশ্য নয়। তাছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারটা প্রকাশ্য হাট-বাজারের কোন বিষয় নয়। আমাদের দেশে যেভাবে বিয়ের সময় বরকে কনে পক্ষের যৌতুক দিতে হয়, তেমনি এখানের কিছু কিছু গোত্রে কনে পক্ষকে বর পক্ষের টাকা দিতে হয়। কখনো এই টাকার পরিমাণ খুব বেশি হয়ে থাকে। তাই অনেকে নিজের গোত্রে বিয়ে করতে না পেরে অন্য গোত্রে বিয়ে করে। এই সুযোগে আমাদের বাঙালী কিছু কাণ্ডজ্ঞানহীন বদমাশ দেশ থেকে মহিলা নিয়ে

আসে। এবং নিজে গার্জিয়ান হয়ে টাকার বিনিময় তাদের বিয়ে দেয়। তবে এই সব চলে অতি গোপনে।

ঃ আপনারা বর্তমানে এখানে খুব সুখে আছেন?

ঃ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্ সুখে রেখেছেন। আল্লাহ্ ছাড়া কে সুখী করতে পারে?

ঃ এই মসজিদ কি বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত?

ঃ হ্যাঁ! এই মসজিদ বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত : এছাড়া এই বস্তিতে আরো সাতটি মসজিদ আছে বাঙালীদের। তবে এটা প্রথম মসজিদ। প্রত্যেক মসজিদে মক্তব, মাদ্রাসা ও হিফজখানা আছে। এই যে বিরাট বস্তি দেখছেন, তা এক সময় জঙ্গল ছিল।

ঃ এখানে বাঙালীরা সাধারণত কি কাজ করে?

ঃ বেশির ভাগই গার্মেন্টেসে।

ঃ বেতন কেমন?

ঃ পিস ওয়ার্ক। কেউ দশ বিশ হাজার রূপীও রোজগার করছে। আর সর্বনিম্ন দু'তিন হাজার।

ঃ ছেলে মেয়েদের লেখা-পড়ার কি ব্যবস্থা?

ঃ স্কুলে যায়। প্রতিটি মহল্লায় মাদ্রাসা আছে। যাদের উৎসাহ নেই তারা এদিক ওদিক কোথাও নেই। দীর্ঘ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চা, বিস্কুট, পানের ব্যবস্থাও ছিল। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হওয়ার পথে দেখলাম, এক দোকানের সাইনবোর্ডে বাংলায় লেখা 'হাসেম রেকর্ডিং হাউস। এখানে বাংলা পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ক্যাসেট, বই ইত্যাদি পাওয়া যায়।' এছাড়া সাথে একটা পানের দোকানও আছে। পান খাওয়ার বাহানা করে দোকানের মালিকের সাথে কথা বললাম। শেষ পর্যন্ত আর পানের দাম নিলো না। বরং চা বিস্কুটের ব্যবস্থা করা হলো। দেখতে দেখতে প্রচুর লোকের সমাগম হয়ে গেল। সবাই বাঙালী। বেশির ভাগ নোয়াখালী ও ফরিদপুরের লোক। তাদের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে বিদায় হলাম। টেক্সি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বাসে উঠলাম। পাকিস্তানের বাস এমনভাবে সাজানো, যেন ময়ূরপঙ্খি। রাত তখন প্রায় বারোটা।

পাকিস্তানের যানবাহন

এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়ার জন্য প্লেইন, ট্রেন, সাধারণ বাস ও উন্নতমানের কোচ রয়েছে। ট্রেনে আবার বিভিন্ন শ্রেণীর আসন রয়েছে। লোকাল বাস সার্ভিস আছে। টেক্সি ও রিক্সা আছে। টেক্সি হলো কার। আর রিক্সা হরো বেবি টেক্সি। সেখানে টেক্সি কার বেশির ভাগ চলে গ্যাস দিয়ে। অর্থাৎ পেট্রোল প্রয়োজন হয় না। বেশির ভাগ গাড়ী দেশীয় কারখানায় তৈরী। আমাদের দেশে যাকে রিক্সা বলা হয়, পাকিস্তানে তা নেই। সেখানে টেক্সি ও রিক্সায় মিটার লাগানো আছে। তবে বেশির ভাগ মিটার খারাপ। ভাড়া প্রতি মিটার বর্তমানে তিন রূপী। ড্রাইভাররা চায় না মিটার হিসাবে যেতে। তারা চুক্তিভিত্তিক যেতে চায়। ড্রাইভার যদি পাঞ্জাবী হয় তবে সাবধান। ওরা ঝামেলায় উস্তাদ। অন্যরা কেউ ভালো কেউ খারাপ। আর যদি ড্রাইভার পাঠান হয়, তবে নিরানব্বই ভাগ ভরসা করা যায়। ওরা হলো একদাম এক কথার লোক।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র কবর

১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুসলিম লীগের নেতৃত্বেই পরবর্তীতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমি হিসাবে পাকিস্তানের জন্ম হয়। মুসলিম লীগ যদিও ভারতের মুসলমানদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পটভূমিতে সৃষ্টি হয়েছিলো, কিন্তু জিন্নাহর নেতৃত্বের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগ কোন গণসংগঠন ছিলো না। বরং তা স্যার নবাবদের বৈঠকখানার সংগঠন ছিলো।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ একটি গণসংগঠনের রূপ নেয় এবং পাকিস্তান আন্দোলনকে শক্তিশালী করে। এরপর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে জিন্নাহ একটি অধ্যায়। কেউ চাইলেও তাকে বাদ দিতে পারবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে জিন্নাহ কতটুকু নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন, তা বিবেচনার বিষয়। তবে জাগতিক দিকে, পাশ্চাত্যের রাজনীতির মানদণ্ডে জিন্নাহ বড় নেতাদের একজন ছিলেন।

করাচীতে জিন্নাহর কবর। তাই ভাবলাম একটু দেখা প্রয়োজন। মাওলানা শামীমকে নিয়ে বাদ ফজর বের হয়ে গেলাম। সাথে আবুল কাসেম। বিরাট এলাকা নিয়ে কবর চত্বর। প্লান করে বিভিন্ন প্রকার গাছ লাগানো। প্রবেশ পথে বিরাট রাস্তার মধ্যখানে পানির ফোয়ারা। এরপর মর্মর পাথরের সিড়ি। অতঃপর গম্বুজের নক্সায় বিরাট ঘর। এই ঘরের ভেতর মরহুম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কবর। সবকিছু মর্মর পাথরের। মূল কবর দু'টি গ্যালারী দিয়ে বেষ্টিত রয়েছে। এর একটি সম্পূর্ণ সোনার এবং একটি রূপার। (আমি কিন্তু সোনা-রূপা পরীক্ষা করিনি। দেখতে সোনা-রূপার মতো লেগেছে। আমার সাথীরা বলেছে এগুলো সোনার তৈরী)।

কবরের চার দিকে চারজন সশস্ত্র সৈন্য দাঁড়িয়ে। বাইরেও সৈন্য রয়েছে। ওরা কিছুক্ষণ পর পর স্যালুট দিচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম, হায়রে নেতা! মরেও তোমাদের স্বশস্ত্র সৈন্যের বেষ্টনিতে থাকতে হয়। কোথায় রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ আর কোথায় তোমাদের অবস্থান। যেমন খলিফা রেখে গেছ তেমনি ব্যবহার পাচ্ছো। কবরের উপরের মতো ভেতর না হলে সবই ব্যর্থ। আল্লাহ্ মাফ করুন এই জাতিকে। রক্ষা করুন আমাদের সবাইকে বিদ'আদ, অপচয় ও কবর পূঁজা থেকে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কবর চত্বরের নিকটেই তার বোন ফাতেমা জিন্নাহ্, পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, যাকে শহিদে মিল্লাত বলা হয়। কারণ ১৯৫১ সালে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায়। পূর্ব পাকিস্তানের এক সময়ের গভর্নর নূরুল আমীনের কবর। সবই মর মর পাথরের ঢালাই।

আল্লাহ্র ঘরের গরীবত্ব

মহানবী (সাঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে যে সকল উপদেশ বাণী উম্মতের উদ্দেশে বলেছিলে তার মধ্যে একটি হলো; তোমরা অন্যান্য জাতির মতো আমার কবরকে ঢালাই করো না। তোমরা আমার অবর্তমানে কবর পূঁজায় লিপ্ত হয়ো না। কিন্তু আজ আমরা করছি বিপরীত। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হলো যে, জিন্নাহ সাহেব ও তার খলিফাদের এত সুন্দর সুন্দর কবরের পাশে যে মসজিদখানা রয়েছে, তা দেখতে অসমাপ্ত চার দেওয়াল ছাড়া কিছুই বুঝা অসম্ভব। যদি দেওয়ালের গায়ে "ইয়ে মসজিদ হে" লেখা না থাকতো, তবে আমরা এটাকে মসজিদ বলে বুঝতাম না। একটি মুসলিম দেশে আল্লাহ্র ঘর মসজিদের এই গরীব অবস্থা সত্যই দুঃখজনক। অন্য কোথাও এমন অবস্থা হলে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু মর্মর পাথরের

খোদাইকৃত কবরসমূহের পাশে একটা মসজিদের এই করুণ অবস্থা মেনে নেওয়া যায় না।

শায়খুল ইসলামের মাজারে কিছুক্ষণ

জিন্নার কবর জিয়ারত করে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি শায়খুল ইসলাম আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী (রহঃ)-এর মাজারে। আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী (রহঃ) দারুল উলূম দেওবন্দের হাদীসের শিক্ষক ছাড়াও একজন বিজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ)-এর শিষ্য ছিলেন। শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহঃ) বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক অগ্নি পুরুষ ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষণা দিয়ে 'জিহাদ সকলের জন্য ফরজে আইন' ফতোয়া দিয়েছিলেন। বৃটিশ সরকার যখন তাকে জেলে বন্দী করেছিলো, তখন তিনি জেলের ভেতর থেকে রেশমের তৈরী রুমালে পরবর্তী কর্মসূচী লিখে পাঠিয়ে ছিলেন। তাই ইতিহাসে এই আন্দোলনকে 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

শায়খুল হিন্দ (রহঃ)-এর ইচ্ছে ছিলো তার ইন্তেকালের পর এই জিহাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিবেন তারই শিষ্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। তাই তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এক বৈঠকে বলেছিলেন, "ভারতবর্ষে আর শায়খুল হিন্দের প্রয়োজন নেই। এখন প্রয়োজন ইমামুল হিন্দের। আমি মনে করি বয়সে তরুণ হলেও মাওলানা আবুল কালাম সেই যোগ্যতা রাখে।" ইমামুল হিন্দ শব্দ নিয়ে সে দিনের বৈঠকে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিলো। তাই সেই বৈঠক অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিলো। পরবর্তী বৈঠক পর্যন্ত আর শায়খুল হিন্দ (রাঃ) এই পৃথিবীতে থাকেননি। তাই অসমাপ্ত আলোচনা অসমাপ্তই থেকে গেলো। পরবর্তীতে মাওলানা আজাদ শায়খুল হিন্দ (রাঃ)-এর চিন্তা ধারার রাজনীতি ছেড়ে করম চাঁদ গান্ধীর চিন্তাধারার কংগ্রেসে গিয়েছিলেন। তখন এই নেতৃত্বের শূন্য স্থান পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন আল্লামা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী (১৮৭৯-১৯৫৭) এবং আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (১৮৮৭-১৯৪৯)।

১৯২৮ ইংরেজীতে এই দুই সংগ্রামী আলেমের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিলো সর্ব ভারতীয় সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। কিন্তু ১৯৪০ এর পর দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রশ্নে মাওলানা মাদানী ও মাওলানা উসমানীর মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয়। মাওলানা মাদানী ছিলেন অখন্ড ভারতের পক্ষে। মাওলানা উসমানী ছিলেন দ্বিজাতিতত্ত্বের পক্ষে। মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহঃ) অনেক চেষ্টা করেছেন মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রঃ)-কে এই কথাটি বুঝাতে যে, অতীতে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, হিন্দু মানসিকতা সম্পর্কে। তাই আমাদের উচিত পৃথক হয়ে যাওয়া। কিন্তু মাদানী (রহঃ) তার অখন্ড ভারত দর্শনে দৃঢ় থাকেন। শেষ পর্যন্ত এই দুই চিন্তায় ভারতবর্ষের উলামায়ে কিরাম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। ১৯৪৫ সালে কোলকাতা মোহাম্মদ আলী পার্কে শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহঃ)কে সভাপতি করে 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' নাম পরিবর্তন করে 'জমিয়তে উলামা-এ ইসলাম' নাম রাখা হয়। জমিয়ত হয়ে গেলো দু'ভাগ, একভাগে মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী অখন্ড ভারতের পক্ষে, অন্যভাগে শাব্বির আহমদ উসমানী (রহঃ) পাকিস্তানের পক্ষে। পাক, ভারত বাংলার প্রসিদ্ধ আলেমদের মধ্যে শায়খুল ইসলামের নেতৃত্বে জমিয়তে উলামা-এ ইসলামে সে দিন যোগ দিয়েছিলেন হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (১৮৬২-১৯৪৩), মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (১৮৮৭-১৯৭৪), মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শফি, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৫-১৯৬৯), মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, মাওলানা ইহতেশামুল হক থানবী, মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, ফুরফুরার মাওলানা আব্দুল হাই সিদ্দিকী, মাওলানা আতাহার আলী (১৮৯৪-১৯৭৬), মাওলানা দ্বীন মোহাম্মদ খান (১৯০০-১৯৭৪)। বাংলাদেশের মধ্যে শুধু সিলেটে জমিয়তে উলামা এ হিন্দের একটু প্রভাব ছিলো। কারণ মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানীর অনেক ভক্ত শিষ্য সিলেটে রয়েছেন এবং রমজানে তিনি সিলেটে প্রায়ই ইতেকাফ করতেন। তবে মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী, মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী ও সিলেটের মাওলানা আতাহার আলী সাহেবের প্রচেষ্টায় সিলেটে পাকিস্তানের পক্ষে বিরাট গণআন্দোলন গড়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত গণভোটে সিলেটের জনগণ পাকিস্তানের পক্ষেই রায় দেয়।

মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীর মাজারের পাশেই মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভীর মাজার। মাওলানা নদভী রাজনৈতিক ময়দানের চেয়ে জ্ঞানের ময়দানে বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার ছিলেন। তাঁর জীবনের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব আমার মতে 'সীরাতুন্নবী' গ্রন্থ। মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই গ্রন্থের প্রথম লেখা শুরু করেছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত জ্ঞানতাপস আল্লামা শিবলী নোমানী (রহঃ)। কিন্তু সমাপ্তির আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। পরে আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নদভী তা সমাপ্ত করেন। কিন্তু পাঠক বইয়ের পটভূমি পাঠ না করলে বুঝবেনই না কার লেখা কোন অংশ। অর্থাৎ জ্ঞানের দিকে সৈয়দ সোলায়মান নদভী এতই অগ্রসর ছিলেন।

শায়খুল ইসলামের মাদ্রাসা

আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী (রহঃ) পাকিস্তান আসার পর করাচীতে একটি দ্বীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাদ্রাসার পাশে একটি মসজিদও ছিলো। কিন্তু সরকার পরবর্তীকালে এটাকে ইসলামিয়া কলেজ করে নিয়েছিলো। বর্তমান অবস্থা শায়খুল ইসলামের চিন্তা-ধারা থেকে বহু দূরে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে ইসলামী তাহাজিব-তামাদ্দুন তেমন নেই। কলেজটি তার মাজারের পাশেই অবস্থিত।

শায়খুল ইসলামের বাড়ী

ইসলামিয়া কলেজের পাশেই শাব্বির আহমদ উসমানী (রহঃ)-এর বাড়ীটি আজ জনৈক প্রভাবশালীর অবৈধ দখলে। অথচ এই বাড়ীতে বসে তিনি পাকিস্তানের জন্য অনেক কিছুই করেছেন। পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলনকারী এই নেতার বাড়ীকে সরকারের উচিৎ ছিলো ঐতিহাসিক কারণে সংরক্ষণ করা।

আফগান মরিজখানা

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহঃ)-এর মাজার, কলেজ, বাড়ী, মসজিদ দেখে ফেরার পথে হঠাৎ দেখি এক বাড়ীর গেইটে ছোট একটি সাইনবোর্ড লাগানো, "ইয়ে তালেবান মরিজখানা হে"। ভাবলাম একটু দেখে যাই। পুরাতন একটা বাড়ী, দরজা-জানালা ভাংগা। আহত ও অসুস্থ তালেবান মুজাহিদরা চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকার জন্য

পাকিস্তানের সরকার এই বাড়ীটি দিয়েছে। সেখানে গিয়ে মাথায় এক নতুন প্লান এলো। যদি আফগানিস্তান সফর করে যাই, তবে কেমন হয়? আমার আবার কোন কিছু মাথায় আসলে অশান্তি শুরু হয়ে যায়। তাই ভাবতে লাগলাম কিভাবে যাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে রুমে ফিরে আসি।

মাওলানা মাজহার প্রকৃত একজন ভালো মানুষ

মাওলানা আব্দুর রহমান ও মাওলানা সিদ্দিকে আকবরকে নিয়ে গুলশান-ই ইকবাল গেলাম। উদ্দেশ্য আফগানিস্তানে যাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং আমার শ্যালক একরামুল হকের সাথে দেখা করা। গুলশান-ই ইকবালে পাকিস্তানের বিশিষ্ট পীরে কামেল হাকীম মাওলানা আখতার সাহেবের মাদ্রাসা আশরাফুল মাদারিস। একরামুল হক এই মাদ্রাসার ছাত্র। মাদ্রাসা পরিচালনা করেন হাকীম আখতার সাহেবের ছেলে মাওলানা মাজহার সাহেব। আফগানিস্তানের শিক্ষা ও চিকিৎসার উন্নয়নে তিনি ইতিমধ্যে বেশ প্রসংশনীয় কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। কান্দাহারের হাসপাতালটি যুদ্ধকালীন সময় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, মাওলানা মাজহার তা মেরামত করে দিয়েছেন। বর্তমানে জামেয়া উমর নামে একটি শিক্ষা প্রকল্পে হাত দিয়েছেন। আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা উমরের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। আমরা দুপুর বারোটায় তার সাথে দেখা করি। পরিচয় দিলাম। আসার উদ্দেশ্য বললাম। একটু হাসলেন। পাশে বসা লোকটিকে বললেন (হয়তো সেক্রেটারী) কলম কাগজ দিতে। আফগানিস্তানের নায়েবে উজিরে খারেজা (পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী) মোল্লা আব্দুল জলিল সাহেবের কাছে পত্র লিখলেন। তা ছাড়া বললেন, করাচীর আফগান সফীর (অর্থাৎ আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত) মোল্লা রহমাতুল্লাহর সাথে দেখা করতে। রহমতুল্লাহর নামে একটি চিরকুট লিখে দিলেন এবং টেলিফোনে বলে দিবেন বললেন। আমরা অবশ্য মোল্লা রহমতুল্লাহকে পাইনি। কারণ যেতে যেতে অফিসের সময় শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

হাবীবের নানা বাড়ী

আলহাজ্ব আব্দুর রহমান করাচীর একজন সফল ব্যবসায়ী। জাতে বাংগালী। কাপড় ও আগরের ব্যবসার সাথে জড়িত। তিনি হলেন হাবীবের নানা। হাবীব হলো আমার মেয়ে মারহামার মামাতো ভাই। সালমার মেঝ ভাই মুফতি ফয়জুল হক করাচীতে লেখা পড়া করেছেন। এরপর বিয়ে করে ভাবীসহ দেশে ফিরেন। আমি আসার আগে জানতে পারি যে, ভাবি বর্তমানে করাচীতে আছেন। তাই সালমা কিছু উপহার সাথে দিলেন। একরামুল হককে নিয়ে হাবীবের নানার গার্ডেন ইষ্টের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে দেখা হলো হাবীবের মামা মাওলানা ইসমাইলের সাথে। বড়ই সরল-সহজ মানুষ। কথা প্রসঙ্গে জানালেন তাঁর ইচ্ছে বাংলাদেশে গিয়ে কোন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার। কিন্তু সরকার যদি সত্যই মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়, তবে সেই ইচ্ছা আর পূরণ হবে না। আমি তাকে আশাহত না হতে বললাম। কারণ সরকার এত বড় দুঃসাহস দেখবে না। তাছাড়া সত্তর বছরের নাস্তিক্যবাদী শাসনের পরও রাশিয়া থেকে ইসলামকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হয়নি। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসকগণ অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। শেখ হাসিনা কিংবা তার দল আওয়ামী লীগের পক্ষেও তা সম্ভব হবে না। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের মত নেতাও বার বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

করাচী থেকে কোয়েটা

আজ করাচী থেকে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে বিদায় হবো। তারিখ ৩রা মার্চ ১৯৯৯ ইংরেজী। এখান থেকে প্রথমে যেতে হবে কোয়েটা। সকালে এয়ারপোর্ট যাওয়ার পূর্বে ভাবলাম মোল্লা রহমতুল্লাহ্র সাথে দেখা করবো। এত সকালে অফিসে থাকার প্রশ্নই হয় না। তাঁর বাসায় টেলিফোন করলাম। কেউ রিসিভ করলো না। শেষ পর্যন্ত না পেয়ে এয়ারপোর্ট চলে গেলাম। কোয়েটায় আফগানিস্তানের সপারতখানা (দূতাবাস) আছে। সেখানে চেষ্টা করবো। করাচী এয়ারপোর্টের অবস্থা আগেই বলেছি বাংলাদেশের মতো। আমরা বেশ ক'জন যাচ্ছি। এয়ারপোর্ট গিয়ে দেখি সীট নেই। অথচ টিকেট ওকে। শুধু যে আমাদের এই অবস্থা তা কিন্তু নয়। প্রচুর যাত্রীর একই অবস্থা। শুরু হয়ে গেল হৈ চৈ। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ একটা উড়োজাহাজের ব্যবস্থা করলেন। সকাল ন'টায় আমরা কোয়েটার উদ্দেশ্যে আকাশে উঠলাম। যেখানে আকাশ পথে করাচী থেকে কোয়েটা এক ঘন্টায় পৌছা যায় সেখানে পাঁচ ঘন্টা লাগলো। পথে অতিরিক্ত দু'টি ষ্টপিজ নিলো। প্রথমটি নিলো টারবাট এয়ারপোর্ট এবং দ্বিতীয়টি নিলো ডালবানডি এয়ারপোর্ট। দু'টাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হয় বাসষ্টপ। একটা পাবলিক টেলিফোন পর্যন্ত নেই। দুপুর দু'টায় আমরা কোয়েটা এয়ারপোর্টে পৌছি।

কোয়েটায় এক রাত

আমরা যারা ১৯৭১ সালের পূর্বের বাংগালী সেনা বাহিনীর ইতিহাস কিছু কিছু জানি, তাদের কাছে কোয়েটা অপরিচিত থাকার কথা নয়। কারণ পাকিস্তান আমলে বাংগালী সৈন্যদের বেশিরভাগের অবস্থান ছিলো কোয়েটায়। আমরা দুপুর দু'টায় কোয়েটা এয়ারপোর্টে পৌছি। একটা গাড়ী নিয়ে সরাসরি আফগান সফারতখানায় চলে যাই। কর্তৃপক্ষ জানালেন যদি তালেবান গাড়ী দিয়ে সীমান্ত শহর চরম পর্যন্ত যেতে হয়, তবে আজ রাত থাকতে হবে। থাকার জন্য কোন অসুবিধা নেই। তাদের নিজস্ব মেহমানখানা রয়েছে। বেশ কিছু কারণে থাকার সিদ্ধান্ত আমরা নিলাম।

প্রথমতঃ পাকিস্তানী পুলিশদের অসৎ ব্যবহার, ঘুষ না দিলে লুট-পাট করে দামী জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ আমার সাথে ক্যামেরা। আফগান সীমান্তে যদি তালেবানরা ব্যাগ পরীক্ষা করে, তবে ক্যামেরা নিয়ে ভেতরে যেতে দেবে না। যদি তালেবান গ্রুপের সাথে যাই, তবে এই ভয় কম। পররাষ্ট্র দফতর পর্যন্ত যেতে পারলেই ক্যামেরার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ কোয়েটা শহর দেখার লোভ। কারণ এই শহরের সাথে আমাদের সেনাবাহিনীর একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে মেজর জিয়াউর রহমানের বীরত্বপূর্ণ অনেক ঘটনা আছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১-এর পূর্ব পর্যন্ত ভারতের সাথে যুদ্ধে পাকিস্তানকে বেশি ডিফেন্স করেছে আমাদের বাংগালী সৈন্যরাই।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীরা ভাবতে পারেন, আমি বার বার বাংগালী শব্দ ব্যবহার করে বাংগালী জাতীয়তাবাদের পক্ষ নিচ্ছি। বাস্তবে আমি কোন প্রকার জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয়। আমি মনে করি, ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের পরিচিতি

ছিলো বাংগালী হিসেবে। কারণ আমরা সেই সময় কখনো ভারতের অংশ আবার কখনো পাকিস্তানের অংশ ছিলাম। কিন্তু ১৯৭১ সালের পর আমাদের একটি স্বাধীন দেশ হয়েছে। তাই আমাদের পরিচিতি এখন বাংলাদেশী। কারণ এখন যদি বাংগালী পরিচয় দেই, তবে প্রশ্ন আসবে কোথাকার বাংগালী? স্মরণ রাখতে হবে ভারত, পাকিস্তান, বৃটেনসহ বিশ্বব্যাপী আজ বাংগালীদের অবস্থান। আমি যে বাংগালী বলছি, তা ১৯৭১-এর পূর্বের বাংগালী।

যাই হোক কোয়েটায় বেশীর ভাগ জনসাধারণ পাঠান। আবহাওয়া প্রচন্ড ঠান্ডা। তালেবান অফিসে জিনিষপত্র রেখে একটা রিক্সা (অর্থাৎ বেবি-টেক্সি) নিয়ে শহরে চলে যাই। শহর আমাদের দেশের শহরগুলোর মতই। আমাদের উদ্দেশ্য পাগড়ী খরিদ করা। কারণ জরুরী বিষয়। আমরা সবাই একটা করে কালো পাগড়ী নিলাম। আমাদের সাথীদের একজনের খুব পানের নেশা। তার ধারণা ছিলো করাচীতে যেমন প্রতিটি মহল্লায় শত শত পানের দোকান তেমনি সমস্ত পাকিস্তানে হবে। কিন্তু কোয়েটায় এসে দেখা গেলো এখানে পানের দোকান নেই। ভদ্রলোক খুব মনঃক্ষুন্ন হলেন। আমরা বললাম, আসুন শেষ চেষ্টা করে দেখি কোথাও পাওয়া যায় কিনা। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখা গেলো একটা পানের দোকান আছে। তবে দাম খুব বেশী। এক খিলির দাম চার রূপী। আমরা সবাই একটি করে খেলাম। বন্ধু মাওলানা এহসান উদ্দিন মোহাম্মদ মুহসিন অনেকগুলো পান, সুপারী, জর্দ্দা খরিদ করলেন। আমরা অবশ্য মনে মনে খুশি হলাম, মাঝে মধ্যে খাওয়া যাবে। এর পর আমরা টেলিফোন একচেঞ্জে এসে করাচী ও বৃটেনে ফোন করি। নসরু, সালমা ও শেফার সাথে আলাপ করলাম। শেফার সাথে আলাপ করে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। সে কাঁদছে

শেফা যদিও বয়সে আমাদের ছোট, তবে সে আমার চার বোনের মধ্যে বড়। শুনেছি বড় বোন মায়ের স্নেহ নিয়ে জন্মে। আজ হলো বাস্তব হলো অভিজ্ঞতা। আমি কি আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি যে সেখানে গেলেই মরে যাবো? কিন্তু এরপরও বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, আত্মীয়, স্বজন সবাই আফগানিস্তানে যাচ্ছি শোনে আতংকিত। ভয়ে সবার চোখে পানি। বাবা তো শোনার সাথে সাথেই মাকে এক গাল শোনিয়ে দিয়েছেন; দেখছো, তোমার কারবারী ছেলে এখন আফগানিস্তানের পথে যাত্রা শুরু করেছে। অপদার্থ কোথাকার? মানুষ বৃটেনে গিয়ে টাকা উপার্জন করে আর তোমার ছেলেরা পাকিস্তান আফগানিস্তান সফর করে, পত্রিকায় লেখা-লেখি করে সময় নষ্ট করে। আফগানিস্তানে এখন যুদ্ধ চলছে। তার সেখানে যাওয়ার কি প্রয়োজন? দেখবে হঠাৎ সংবাদ পাবে তোমার ছেলের উপর বোম এসে পড়েছে। সে শহীদ হয়ে গেছে। বাহঃ কি খুশি তুমি হবে শহীদের মা। সে পাইছে কি? সে কি আমাদের সবাইকে রেখে বেহেস্তে চলে যাবে? মোটেই পারবে না। আমি কিন্তু বন্দুক নিয়ে তার বেহেস্তের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবো, ইত্যাদি। আম্মা বেচারী এমনি চিন্তিত। এরপর বাবার ব্যঙ্গাত্মক কথা। আমরা যখন কিছু করি, তখন বাবা সব রাগ মাকে দেখায়। আর ভালো কিছু করলে নিজে অহংকার করে। দোষের সময় আমরা যেন শুধু মা-এর সন্তান। এটা হয়তো সব বাবাদেরই চরিত্র। আমিও এখন নিজের মধ্যে এই চরিত্র খুঁজে পাই।

যাই হোক। টেলিফোন পর্ব শেষ করে রিক্সা নিয়ে অফিসে ফিরে আসি। শীতল বায়ুর এলাকা হলেও রিক্সা অর্থাৎ বেবি টেক্সিতে ঠান্ডা এত বেশি লাগে না। কারণ দরজা আছে। বেবি টেক্সিতে দরজা জীবনের প্রথম দেখলাম।

আফগানিস্তানের কোয়েটা প্রতিনিধির নাম এই মুহূর্তে স্মরণ হচ্ছে না। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। এখানে অফিস বলতে আহামরি কিছু নয়। আমাদের দেশে গ্রাম্য মক্তবগুলোতে যেমন দফতর হয় তেমনি। প্রধান অফিসার যিনি, তার উদাহরণও আমাদের দেশের গ্রামের সরল সহজ কওমী মাদ্রাসার একজন শিক্ষকের সাথে দেওয়া যায়। ছিলেনও হয়তো তাই। সালাম করে মুসাফাহা করলাম। তিনি এক নিঃশ্বাসে বলতে লাগলেন; 'ছাংগে, জুরে, তাগরে, তবিয়েত খেদে, পা খায়েরদে, শে, উহ, বাচ্চা-মাচ্ছা খেদে, হান্ডি ওয়ালা খেদে।' আমি কিন্তু কিছুই বুঝলাম না। শুধু চেয়ে থাকলাম তাঁর দিকে। পরে বুঝলাম এসব অর্থ কি। ছাংগে-কি অবস্থা? জুরে-ভালো আছেন? তাগরে-শরীর কি ভালো আছে? তবিয়েত খেদে- মেজাজ ভালো তো? পা খেয়ের দে-ভালো। শে-হ্যা ভালো। উহ- হ্যা। বাচ্চা-মাচ্ছা খেদে- ছেলে-মেয়ে ভালো তো? হান্ডি ওয়াল খেদে-সাথী ভালো আছে তো?

আমাদের যিনি রাহবর তিনিও এই কথাগুলো উচ্চারণ করে উত্তর দিলেন। এরপর বললাম, আমাদের উদ্দেশ্য। ভদ্রলোক মোটামুটি উর্দু জানেন। মাওলানা মাজহার সাহেবের মোল্লা আব্দুল জলিলের নামে যে চিঠি ছিলো তা এগিয়ে দিলাম। তিনি টেলিফোন হাতে নিয়ে কার কাছে জানিনা ফোন করলেন। পশতুতে কি বলে রিসিভার আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। অপর প্রান্ত থেকে শুধু নাম জিজ্ঞেস করা হলো। নাম শোনে বললেন; শোকরিয়া! উস কো দে- দো। আমি রিসিভার ফিরিয়ে দিলাম। তারা দু'জন কি যেনো আলাপ করলেন। রিসিভার রেখে বললেন, "সকালে যে গাড়ী যাবে, তাতে উঠে চলে যাবেন। রাতেই আমি ওদেরকে বলে দেবো।" আমরা ফিরে এলাম মেহমানখানায়।

কোয়েটা থেকে চমন

সকালে ফজরের নামাজ শেষে নাস্তা পর্ব সমাপ্ত হলো। আটটায় গাড়ীতে উঠলাম। এই গাড়ী আমাদেরকে নিয়ে যাবে পাকিস্তানের শেষ সীমান্ত চমন শহরে। চার ঘন্টা সময় লাগবে। গাড়ী চলতে লাগলো। পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে গাড়ী যতই অগ্রসর হচ্ছে, ততই নিজের মনে চঞ্চলতা উপলব্ধি করছি। অপেক্ষার চার ঘন্টা প্রায় চার শহরে অতিক্রম হলো। আমরা দুপুর বারোটায় চমন এসে পৌছি। চমন যদিও পাকিস্তানের সীমান্তে, কিন্তু পাকিস্তান সরকারের শাসন সেখানে চলে না। বেশির ভাগ জনগোষ্ঠী পাঠান। সেখানের এম, পি হচ্ছেন মাওলানা আব্দুল গনি। তাঁর সাথে কিছুদিন পূর্বে বার্মিংহামে দেখা হয়েছে। দেওবন্দী আলেম। দেখেই বুঝা যায় নেক এবং আল্লাহ্ওয়ালা। তিনি পাকিস্তান সরকারের সাথে আলোচনাক্রমে চমন এলাকায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করেছেন। আফগানিস্তানের মতো পূর্ণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে না, যেহেতু চমন পাকিস্তানের একটি অংশ। কোয়েটার মতো চমনের আবহাওয়াও ঠান্ডা। আমরা চমন শহর থেকে একটি গাড়ী নিয়ে আফগান সীমান্ত এলাকায় পৌঁছলাম।

(চলবে)

পতনের ডাক

সাদেক হুসাইন সিদ্দিকী

কীভাবে বোধ-উপলব্ধিহীন এক আয়েসী খলীফার অপরিণামদর্শী পদক্ষেপের কবলে শত শত বছরের ঐতিহ্যবাহী আব্বাসী খেলাফতের পতন ঘটল। কাদের ষড়যন্ত্রে একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বশক্তি নিস্তনাবুদ হল। খেলাফতের মসনদ দখলের হীন উদ্দেশ্যে কারা আহ্বান করেছিল রক্তলোলুপ, অর্থলোভী চেঙ্গিস খাঁনকে। কত নির্মম পরিণতির শিকার হয়েছিল খলীফা, শাহী খান্দান, আলেম-ওলামা ও লক্ষ কোটি মুসলিম জনতা। কত রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল দজলায়। সেই মর্মন্তুত ইতিহাসের উপন্যাসিক রূপ- 'পতনের ডাক'।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুর ঝংকার

শাহজাদা আহ্‌মার। সে মোসতানসের বিল্লাহ্‌র ভাই আফাজীর পুত্র। আর মোসতা'সেম বিল্লাহ হলো মোসতানসির বিল্লাহ্‌র পুত্র। এই মোসতাসেম বিল্লাহ হলেন বর্তমান খলীফা। আহ্‌মার হলো খলীফার চাচাত ভাই।

তার বাসভবন শাহী মহল 'কস্‌রুল খুলদ'-এর সন্নিকটে। আহ্‌মাদ আবুল কাসেমের বাসভবনও তার বাসভবনের নিকটে। উভয় বাসভবনের মাঝে ছিল এক নয়নাভিরাম পার্ক, ফুলের বাগান। এর মাঝ দিয়ে কুল কুল রবে প্রবাহিত ছিল ঝর্ণাধারা। উভয় মহলের সীমানার মধ্যে ছিল সুন্দর সুন্দর ফল ও ফুলের বাগান। বাগানের ভিতর ছিল একাধিক ফোয়ারা। অফুরন্ত বিত্ত-বৈভবের মাঝে কাটত তাদের বিলাসী জীবন।

শাহজাদী নাজমা আহমারকে সন্ধ্যায় খানার দাওয়াত দিয়েছিল। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিবের নামায আদায় করে আহ্‌মার মহলের দিকে পা বাড়াল।

সূর্য ডুবার সাথে সাথে কৃত্রিম আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শাহী মহল। বাগানগুলোও আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত।

আহ্‌মার বাগানের মধ্য দিয়ে মাঠের অপর প্রান্তে শাহী মহলের বেলকনিতে এসে দাঁড়ায়। বেলকনির উপর ছিল সাদা সিমেন্টের আস্তরণ। তার গা ঘেঁষে বেড়ে ওঠা উঁচু শাহী মহলগুলোও ছিল ধবধবে সাদা। বাগানের বিচ্ছুরিত আলোয় জ্বলজ্বল করছিল সাদা মহলগুলো। আহমার বেলকনি পেরিয়ে শাহী মহলে প্রবেশ করে একটা কক্ষ পেরিয়ে দ্বিতীয় কক্ষে চলে আসে।

প্রতিটি কক্ষের দরজাগুলোয় ছিল ভারী রেশমী পর্দা। নিচে ছিল মূল্যবান কার্পেট। বিস্তীর্ণ ছাদ। সোনালী রং-এ উজ্জ্বল দেয়ালগুলো ডোরাকাটা- সবুজ, সোনালী ও উজ্জ্বল আকাশী রং। প্রতিটি কক্ষের ছাদ ও দেয়ালের রং ভিন্ন। দেয়ালের রংয়ের সাথে মানানসই করে ঝুলান হয়েছিল দরওয়াজার পর্দাগুলো।

প্রতিটি কক্ষ ছিল চীনা ফুলদানী ও সোনা-চাদীর বাহারী আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। কক্ষগুলো এত বেশি আলোয় উদ্ভাসিত ছিল যে, সামান্য একটি সূচ পড়ে থাকলেও তা চোখে পড়ত।

বহু দাসী ছিল এ মহলে। তারা ব্যস্ত ছিল বিভিন্ন কাজে।

আহমার দেখল, নাজমা এক কক্ষে বসে আছে। তার মাথায় শোভা পাচ্ছে সোনালী শাহী তাজ। পরণে কালো রেশমী পোষাক। গলায় ঝিলিমিলি মুক্তার হার। পরীর মত মনে হচ্ছে নাজমাকে। তার আয়নার মত উজ্জ্বল চেহারায় আলোর ঝলক পড়ায় মনে হচ্ছিল, যেন বিদ্যুৎ খেলছে তার অবয়ব জুড়ে।

আহ্‌মারকে মিষ্টি চোখে দেখল নাজমা। মৃদু হেসে তাকে হৃদয় নিংড়ানো অভিবাদন জানাল। পাশের একটি সোফায় বসল আহ্‌মার।

নাজমা কৌতুক করে বলল, মনে হয় খুব খিদে পেয়েছে তোমার।

আহ্‌মার রাসভারী কণ্ঠে বলল, ক্ষুধায় তাড়িয়ে আনেনি বটে। তোমার 'চাঁদ মুখ' দর্শনের আকর্ষণ আসতে বাধ্য করেছে।

আহ্‌মার শাহজাদী নাজমাকে সখ করে 'চাঁদ' বলে ডাকে।

নাজমা বলল, ক্ষুধার্থ লোকটি কথা ঘুরিয়ে না বলে সরলভাবে বললেই ভাল লাগত।

আহ্‌মার ঃ হৃদয়ের কথাই তোমাকে বলেছি। তুমি যদি আমার সামনে থাক, তবে বেহুঁশে খানার কথা ভুলে যাব বৈকি।

আহ্‌মারের কথায় নাজমা শরম পায়। সে আলোচনার বিষয় পাল্টিয়ে বলে, আমার বান্ধবী হাজেরা এখনি এসে পড়বে।

আহ্‌মার বলল, নাজমা, হাজেরার সাথে বেশি মাখামাখি কর না! সে ইবনে আলকামীর মেয়ে। ইবনে আলকামী ঘোর শিয়াপন্থী।

নাজমা বলল, তা জানি। ইবনে আলকামী ভাল লোক নয় তাও জানি। তবে হাজেরা সত্যিই একটি ভাল মেয়ে।

আহ্‌মার ঃ আমি শুনেছি, ইবনে আলকামী বিভিন্ন সময় শাহী মহলে এ কারণে লোক পাঠায়, তার ব্যাপারে কে কি বলে তা জানার জন্য।

নাজমা ঃ আমি নিশ্চিত বলতে পারি, হাজেরা তার বাবার গোয়েন্দা নয়। তবে.....

আহ্‌মার বলল, 'তবে' কি?

নাজমা বলল, তবে ইবনে আলকামী চাচ্ছে, নাজমার সাথে শাহজাদা আবু বকরের বিয়ে হয়ে যাক।

আবু বকর হলো মোসতা'সিম বিল্লাহর পুত্র।

আহ্‌মার বলল, আমি দু'একবার হাজেরাকে দেখেছি। সে অত্যন্ত সুন্দরী। আবু বকর তাকে পছন্দ করতে পারে।

নাজমা বলল, সমস্যা হল, হাজেরা কামনা করছে ভাইজান আবুল কাসেমকে।

আহ্‌মার ঃ আহ্‌মাদ আবুল কাসেমের সাথে হাজেরার বিয়েতে ইবনে আলকামী রাজী না-ও হতে পারে। সে ভাল করেই জানে, আবু বকরের সাথে তার মেয়ের বিয়ে হলে একদিন সে দেশের রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে।

নাজমা ঃ তুমি ঠিক বলেছ। খলীফা হয়তো ভাইজানের সাথে হাজেরার বিবাহে সম্মতি দিবেন না।

আহ্‌মার ঃ খলীফা এক আশ্চর্য চরিত্রের লোক। তার ঐ যে কূপ.....

কূপের কথা শুনতেই নাজমার চেহারায় পেরেশানী দেখা যায়। সে বলে, আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে আর কখনো কূপের কথা উল্লেখ করো না।

আহ্‌মার ঃ ক্ষমা প্রার্থী। কূপের কথা উল্লেখ করে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে। আর কখনো কূপের কথা বলব না।

এমন সময় হাজেরা এদের কক্ষে এসে দাঁড়ায়। তার পরণে ছিল অত্যন্ত মূল্যবান পোষাক ও চমৎকার অলংকার। মাথায় ছিল রাজকীয় তাজ। আসলেই হাজেরার চেহারা ছিল নিখুঁত এবং পরীর চেয়েও উজ্জ্বল। নাজমা হাজেরাকে সোৎসাহে অভিবাদন জানায়। উভয়ে এক সোফায় পাশাপাশি বসে যায়। হাজেরা আহ্‌মারকে বলে, দীর্ঘদিন পর আপনার সাথে মোলাকাত হল।

আহ্‌মার ঃ সেও তো ঘটনাচক্রে এবং নাজমার কল্যাণে।

নাজমা এবার টিপ্পনি কেটে বলে, বহু আগেই তার ক্ষুধা লেগেছে। এখন যা-তা বলছে।

হাজেরা ঃ আমারও ক্ষুধা লেগেছে।

নাজমা ঃ ভাইজানের অপেক্ষা করছি।

আহ্‌মাদ আবুল কাসেম কক্ষে প্রবেশ করে বলে, আমিও এসে গেছি।

নাজমা বলল, ভাইজান তুমি বহু দেরী করে ফেলেছ।

আহ্‌মাদ ঃ হ্যাঁ, দেরী হয়ে গেছে। আজ শহরে এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে।

নাজমা ঃ কি হয়েছে!

আহ্‌মারের পাশে সোফায় বসতে বসতে আহ্‌মাদ বলে, কি আর বলব; হাজেরা আবার কি মনে করে। ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক।

হাজেরা বলল, এ দুর্ঘটনার কথা আমিও শুনেছি। শিয়া ও সুন্নীর মাঝে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে। এখন তা ফাসাদে রূপ নিয়েছে।

কিছু শিয়া মনে করেছে, তারা যা করবে ইবনে আলকামী তাতেই সমর্থন জানাবে। তাদের এ ধারণা ভুল। বড় বেড়েছে তারা। বলল নাজমা।

আহ্‌মাদ ঃ ঘটনাক্রমে আমি ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ঝগড়াটা মারামারির দিকে গড়াচ্ছিল। আমি উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে শান্ত করি। আমি ঐ সময় ওখানে না পৌঁছলে বড় কোন ফাসাদ ঘটার সম্ভাবনা ছিল।

নাজমা ঃ আফসোস, কি হলো মুসলমানদের, তারা পরস্পরে মারামারি করে মরছে।

আজকের গন্ডগোলের সূত্রপাত ঘটিয়েছে কয়েকজন শিয়া। আমি আব্বার সাথে এ বিষযে আলোচনা করেছি। ওয়াদা করেছেন, তিনি শিয়াদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবেন। হাজেরা বলল।

আহ্‌মাদ ঃ এ ব্যাপারে তিনি আন্তরিক হলে কোথাও গন্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

আহ্‌মার ঃ এ প্রসঙ্গে আমি কিছু বললে হাজেরা মনে কষ্ট পাবে হয়তো। তাকে কষ্ট দিতে চাই না।

আমি কিছুই মনে করব না। যা বাস্তব ও সত্য, তা অকপটে প্রকাশ করতে হবে। বলল হাজেরা।

কিছু শিয়া চরম বাড়াবাড়ি করছে, তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে যেখানে সেখানে সুন্নীদের সমালোচনা করছে। অল্প সময়ের মধ্যে এমন কোন ফেৎনা ঘটার আশংকা রয়েছে, যাতে পুরো শহরবাসীর নিরাপত্তাহীনতায় নিক্ষিপ্ত হবে। আদৌ সুবিধা মনে হচ্ছে না পরিস্থিতি। আহ্‌মার ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল কথাগুলো।

আমি আব্বাকে জোর দিয়ে বলব, তিনি যেন যে কোন মূল্যে শিয়াদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। হাজেরা বলল।

এমন সময় দাসীরা এসে খানা তৈরি হওয়ার কথা জানায়। চারজন উঠে খাবার কক্ষে গেল। বিরাট এক কক্ষ। এর দেয়াল লাল রংয়ের পর্দা এবং ছাদের রংও লাল। লাল দেয়ালের সাথে ঝুলান সাদা রেশমী কাপড়। গোল করে রাখা ছিল সোফাগুলো। সোফার সামনে টেবিল। টেবিলে বিছানো হয়েছে দস্তারখান। দস্তারখানার উপর রূপার পেয়ালা-পাত্রে হরেক রকম খাবার।

দাসীরা চিলমচী এনে তাদের হাত ধুইয়ে দেয়। সকলে খেতে শুরু করে।

খানা শেষে হাত ধুয়ে তোয়ালিয়ায় হাত-মুখ মুছে ওখান থেকে উঠে সামনের বড় এক কক্ষে যেয়ে সকলে বসেছে। ওখানে বেশ কয়েকজন অল্পবয়সী সুশ্রী দাসী সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। তারা সেখানে পৌঁছতেই বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠে। একই সাথে তারা সুর করে গান ধরে।

আহ্‌মার চলে যেতে চাইল। আহ্‌মাদ তাকে যেতে দিল না।

আহ্‌মার বলল, আচ্ছা, তবে নামায পড়ে আসি।

নাজমা টিপ্পনি কেটে বলে, বহুত আচ্ছা মোল্লাজী।

সে নামায আদায় করে ফিরে এসে দেখে জবরদস্ত গান হচ্ছে। তাদের গান শেষ হলে সবাই বলে, এবার নাজমা ও হাজেরা দ্বৈত কণ্ঠে গান শুনাবে।

নাজমা ও হাজেরা প্রস্তুত হয়েছে। বাজনা শুরু হয়ে গেছে। উভয়ে এক সাথে গান গাচ্ছে। গানে গানে মাতিয়ে তুলেছে সবাইকে। গান শেষ হয়েছে। শুধু নিক্কন বাজছে। গানের ঝুমে আহ্‌মাদ এখনো দুলছে।

বনী বুইয়াহ্

শাহজাদা আহ্‌মাদ আবুল কাসেম সত্য বলেছিল, 'শিয়া-সুন্নীর মাঝে দ্বন্দ্ব হয়েছিল এবং তা সংঘাতের পর্যায়ে সে দাঁড়িয়েছিল।'

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মাঝেও এমনি এক দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। দুনিয়ার মুসলমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক ভাগ পরিচিত হল শিয়ানে আলী নামে, দ্বিতীয় ভাগ শিয়ানে মু'আবিয়া নামে।

শিয়ানে আলী বলে যারা নিজেদের পরিচয় দিত এবং হযরত আলী (রাঃ)-র পক্ষে মিছিল করত, তারা আশ্চর্য ধরনের লোক ছিল। হযরত আলী (রাঃ)-এর উপর নাখোশ হয়ে তারা কেটে পড়ল। তবে তারা খামুশ রইল না। হযরত আলী (রাঃ)-এর সমালোচনা শুরু করল। কিছু লোক সমালোচনা করছিল মাত্রাতিরিক্ত। ইতিহাসে এরাই খারেজী নামে চিহ্নিত। বিভিন্নভাবে বহু প্রক্রিয়ায় তারা হযরত আলী ও হুসাইন (রাঃ)-কে কষ্ট দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এরাই তাঁদের শহীদ করেছিল।

তখন শিয়ানে আলী বলে যারা পরিচিত ছিল মুসলমানদের মতই তারা ধর্ম পালন করত। ধর্মীয় বিষয়ে পরস্পরের কোন পার্থক্য ছিল না বটে, তবে রাজনৈতিক বিরোধ ছিল চরম। খারেজী, শিয়া ও সুন্নী সকলে সেভাবেই অযু-গোসল করত, আযান দিত ও নামায আদায় করত যেভাবে প্রিয় নবী (সাঃ) আদায় করতেন।

রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়-আসয় নিয়েই ছিল দ্বন্দ্ব-এসব কারণেই একে অপরের চরম সমালোচনা করত। পরস্পরে দ্বন্দ্ব হলেও সকলে মসজিদে আসত, সবাই কুরআন তেলাওয়াত করত, আযান ও নামায আদায় করত একই নিয়মে। প্রায় তিন শ' বছর পর্যন্ত এভাবেই চলছিল উভয় দল। রাজনীতি ছিল তাদের দ্বন্দ্বের মূল কারণ।

বনী আব্বাসীয় খেলাফতের দুর্বলতা দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। তখন আব্বাসীয় খেলাফত নামে মাত্র দাঁড়িয়ে আছে। সাম্রাজ্যের মূল নেতৃত্বে চলে আসে বনী বুইয়াহদের হাতে। আব্বাসীয় খলীফার দুর্বলতা ও পতন আঁচ করে তারা ধর্মীয় দ্বন্দ্ব উসকে দেয়। আলাদা মাযহাব হিসেবে শিয়ার আবির্ভাব ঘটে।

এই জঘন্য শিয়াতন্ত্রের সূচনা করেছিল মোয়েযযুদদৌলা বিন বুইয়াহ দাইলামী। সে ছিল আস-শুজা বুইয়াহ্-এর কনিষ্ঠ সন্তান। এই মোয়েযযুদ্দৌলা বাগদাদ দখল করে আব্বাসী খলীফা মুকতাদী বিল্লাহ্‌র চোখ উপড়ে ফেলে। তাকে জেলে বন্দী করে রাখে। তারই রাজাসনে উপবিষ্ট করায় পুতুল খলীফা আবুল কাসেম ফযল বিন মুকতাদির বিল্লাহকে। এ ঘটনা ঘটে ৩৩৪ হিজরীতে। নতুন গদ্দীনশীন পুতুল সুলতানকে খতীউল্লাহ খেতাবে ভূষিত করা হয়। মোয়েযুদ্‌দৌলা খলীফার জন্য নির্দিষ্ট অংকের ভাতা জারি করে। খেলাফতের মূল কর্তৃত্ব সে নিজের হাতেই রাখে। নিজের নামেই মুদ্রা ছাপায়।

মোয়েযযুদ্‌দৌলা আপন নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের এই সুযোগে ক্ষমতাকে আরো পাকা করার বদনিয়াতে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব উস্কে দিয়ে নিজের পক্ষে লোক ভিড়ানোর হীন তৎপরতায় মত্ত হয়। অনুকূল হাওয়া পেয়ে শ্রাবণের তুফানের মত ফুঁসে উঠে শিয়াবাদ। মোয়েযযুদদৌলা নিজেও ছিল শিয়া। ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিকে মুখে মুখে হযরত আলী (রাঃ) তাঁর ও আওলাদদের প্রতি সুধারণা প্রকাশ করত বটে। কিন্তু সুযোগমত আপন ভ্রান্ত ধারণার প্রকাশ ঘটিয়ে শিয়াদের সাথে একাত্ম হয়ে যায়।

লোকটা ছিল চরম অত্যাচারী ও খামখেয়ালী। সামান্য অপরাধে মানুষকে কঠিন শাস্তি দিত। তার জুলুম ও জবরদস্তিতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। জনতা দারুণ ভয় করতে থাকে তার জুলুম ও রাজনৈতিক চালবাজীকে। এই বদবখত বাগদাদ জামে মসজিদের প্রধান দরওয়াজায় এই কথা লেখাবার দুঃসাহস দেখায় ঃ

"মু'আবিয়া, আবু বকর, ওমর ও ওসমানের উপর লানত বর্ষিত হোক।" নাউযুবিল্লাহ।

সে ভেবেছিল, লোক এরূপ লেখা দেখেও তার ভয়ে কিছু বলবে না। না, এই লেখা দেখেই জনতা তার এই ধৃষ্টতার প্রতিবাদ জানায়। তারা তৎক্ষণাৎ এই লেখা মুছে ফেলার দাবি জানায়। অল্প সময়ের মধ্যে এর প্রতিবাদে আগুনের মত জ্বলে উঠল পুরো শহর। শহরে দাঙ্গা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পুতুল খলীফা খতীউল্লাহ তাকে বিষয়টা বুঝায়। কিন্তু সে বুঝার চেষ্টা করল না। সে জেদ ত্যাগ করল না। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছিল প্রতি মুহূর্তে। উপায় না দেখে ওয়াজিরে আজম মুহাম্মদ বিন মাহদী-যিনি সুন্নী ছিলেন তিনি কৌশল করে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, যদি ওটা মুছে এ বাক্যটি লিখে দেয়া হয়, তবে উভয় পক্ষের কারো আর প্রতিবাদ করার সুযোগ থাকবে না। সে রাজি হল। পূর্বের লেখা মুছে মসজিদের প্রধান দরওয়াজার উপর লিখে দেয়া হল ঃ

"মু'আবিয়া ও আহ্‌লে রাসূলের উপর যারা যুলুম করেছে তারা অভিশপ্ত।"

মোয়েযযুদ্দৌলার নাম ছিল আহমাদ। তার মধ্যে শিয়াপ্রীতি ছিল অতিমাত্রায়। দূর দূরান্তের শিয়ারা এ খবর শুনে তারা ব্যাপকহারে বাগদাদে এসে আস্তানা গড়ে। সে তাদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক সরকারী সুবিধা দিতে থাকে। দিন দিন শিয়াদের সংখ্যা বাড়তে থাকে বাগদাদে। শিয়ারা মোয়েযযুদদৌলাকে ধর্মীয় গুরু হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। ফলে সে যা বলত শিয়ারা তাই করত। তাদের প্রতি মোয়েযযুদদৌলার আর্থিক সহযোগিতা বাধ্য করেছিল তাকে সমর্থন করতে। এই অর্থ তদেরকে অন্ধ করেছিল সত্যের পথে চলতে।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর প্রতি মোয়েয্‌যুদ্‌দৌলা চরম শত্রুতা ও ঘৃণা পোষন করত। তাই সে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাত বরণের দিন-১৮-ই জিলহজ্বকে 'ঈদে গদীর' হিসেবে ঘোষণা করলে ভক্তরা সোৎসাহে তা পালন করে। সারা দিন তারা ঢোল-তবলা বাজিয়ে আনন্দ করে। খানা-পিনাসহ নাচ-গানের বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মদ পান চলে মাত্রা ছাড়িয়ে। ঐ দিন আনন্দে উৎফুল্ল ছিল শিয়াপন্থী সকল সদস্য। সে বছর থেকে শুরু হয় 'ঈদে গদীর" নামক অনুষ্ঠানের।

মোয়েয্‌যুদ্‌দৌলা ছিল বাগদাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। খলীফা ছিল তার ভাতাভোগী পুতুল। তবে সে-ই খলীফাকে যেহেতু রাজাসনে অধিষ্ঠিত করিয়েছিল, তাই খলীফা তার মতের উল্টা কিছু করত না। উল্টা করার মুরোদও তার ছিল না। "যাচ্ছে তাই করত মোয়েয্‌যুদ্‌দৌলা। ইসলামী দুনিয়ায় তার নামে মুদ্রা জারী করা হল। সর্বত্র তারই নামে খুৎবা চলছিল। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল ইসলামী দুনিয়ার সব মানুষ তার অনুসরণ করুক। সবাই শিয়া হয়ে যাক।

দাঙ্গা-বাজ

বনু বুইয়াদের শাসনামল ৩৩৪ হিজরীতে শুরু হয়ে ৪৪৭ হিরজীতে শেষ হয়। এই সোয়াশো বৎসরের ইতিহাস মুসলমানদের মাঝে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা, কপটতা ও নেফাকী সৃষ্টির ইতিহাস। এ দীর্ঘ সময় মুসলমানদের দু'টি দল শিয়া ও সুন্নির ঝগড়া-ফ্যাসাদ, বিবাদ-বিসম্বাদের কলংকময় ইতিহাস। হাঙ্গামা ও মারামারির সাথে সাথে উভয় দলে কপটতা ও নেফাকীরও চরম বিস্তার ঘটেছে।

ইতিহাস বলে, বুইয়া ছিল জেলের ছেলে। আহ্‌লে বাইতকে ভালবাসার দাবীদার শিয়ানে আলীর এক লোকের হাতে সে মুসলমান হয়েছিল। তাই তাকে শিয়া বলা হত। তার সন্তানরা উন্নতি করতে করতে শাসক পর্যন্ত হয়েছিল। রাজার আসন দখল করেছিল। কিন্তু আফসোসের কথা, বনু বুইয়ারা আহ্‌লে বাইতের সাথে কখনো সদাচারণ করেনি। তাদের মান-সম্মানের দিকে কখনো খেয়াল রাখেনি। রাজ্য পরিচালনায়, শাসন কার্যে তাদের কোন অংশ দেয়নি। তাদের কোনরূপ সহযোগিতাও করেনি। ওরা শুধুমাত্র মুখে মুখেই আহলে বাইতের মুহাব্বত আর ভালবাসার দাবীদার।

আসলে এটা ছিল তাদের এক প্রতারণা। এক ধোকাবাজী তারা মন দিয়ে আহ্‌লে বাইতকে মোটেও মুহাব্বত করত না। বরং মুখে মুখে তাদের ভালবাসার কথা প্রকাশ করে তারা আহ্‌লে বাইতের মুহাব্বতকারীদের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করেছে। আর তারা তা হাসিল করেও নিয়েছে। তারাই মুসলমানদের মাঝে দু'টি দল সৃষ্টি করে একটি দলকে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় এতো শক্তিশালী করল যে, তারা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তাদের উপর কথায় কথায় নির্যাতন চালাত। তাদের কোণঠাসা করে রাখত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত থাকবে আর তাদের হুকুমত ও রাজত্ব স্থায়ী হবে।

মুসলমানদের সরলতা ও অকপটতাকে পুজি করে তারা সোয়া শ' বৎসর মুসলামনদের শাসন করেছে। কিন্তু যারা মুসলামনদের মাঝে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্বেষের বীজ বপন করেছিল, একদিন তারা সেই কপটতার শিকার হল। কপটতা গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করল। সেই গৃহযুদ্ধই তাদের ধ্বংস করে তারা রাজত্ব হারায়। তারা নির্বংশ হয়ে যায়। পৃথিবীর উপর কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট রইল না তাদের।

কিন্তু যে বিদ্‌আত, যে কুসংস্কার, যে আচার-আচরণ আর যে কুফুরী রসম-রেওয়াজ তারা রেখে গেছে, তা আজো মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান। আর সবচে বড় কথা হল, তারা মুসলমানদের মাঝে যে কপটতা ও নেফাকীর সৃষ্টি করেছে, তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পেতে মুসলমানদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে।

বনু বুইয়াদের হুকুমত ধ্বংসের পর যদিও শিয়াদের সেই প্রভাব প্রতিপত্তিতে ভাটা পড়েছে, রাজক্ষমতা তাদের হাতছাড়া হয়েছে, কিন্তু তাদের সংখ্যাধিক্যের অহংকারে কারণে-অকারণে ঝগড়া-বিবাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হতো।

তারপর আব্দুল্লাহ আবু আহমদ খলীফা হয়ে মুসতাসিম বিল্লাহ উপাধী ধারণ করলে মানুষ ধারণা করল, হয়তো আব্বাসী খিলাফতের টলটলায়মান সিংহাসনটি আবার শক্ত পায়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এই খলীফা ছিল ভীতু, নির্বোধ আর কুমতিপরায়ণ। সে মুয়ায়্যিদুদ্দীন ইবন্ আলকামীকে তার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করল। ইবন্ আলকামী ছিল এক কট্টরপন্থী শিয়া। তবে অত্যন্ত সজাগ, দারুণ ধূর্ত। সে খলীফার উপর এমনিভাবে তার প্রভাব ফেলল যে, খলীফা তাকে খিলাফতের মালিক মোখতার বানাল। পরিশেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, খলীফা শুধুমাত্র নামে মাত্র খলীফা রইল। আর ইবন্ আলকামীই খিলাফতের সকল কাজ পরিচালনা করতে লাগল। এতে শিয়ারা আবার উজ্জীবিত হল। আবার ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হল। প্রকাশ্যে সমালোচনা ও গালমন্দ করতে লাগল সুন্নীদের।

খিলাফত সম্পর্কেই দাঙ্গাবাজ শিয়ারা প্রশ্ন করত। তারা জলীলুল কদর সাহাবীদের নির্মল চরিত্রে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করত। মুইজ্জুদ্দৌল্লাহর পূর্বে অবস্থা এমন ছিল না, সে সময় পরস্পরে এ ধরনের কুৎসিত আলোচনা হত না, সে সময় দলাদলিও ছিল না। শুধুমাত্র মুসলমানরা দু'টি ভাগ হয়েছিল। তবে তাদের মাঝে রাজনৈতিক মতানৈক্য ছিল। কিন্তু মুইজ্জুদ্দৌল্লাহ এসে তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি-করল। কাল পরিক্রমায় তা তীব্র আকার ধারণ করল। কারণ মুইজ্জুদ্দৌলাহর পর স্বার্থবাদী সেই সব লোক ক্ষমতায় এসেছিল, যারা নিজেদের ক্ষমতা প্রভাব ও প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সেই হিংসা ও বিদ্বেষের জ্বলন্ত শিখায় আরো ইন্দন যুগিয়েছিল। পরিস্থিতি তারা বিস্ফোরণমুখ করে তুলেছিল। এ সবই ছিল স্বার্থবাদীতার ফসল।

তবে উভয় দলেই কিছু চিন্তাশীল ও পরিণামদর্শী ব্যক্তি ছিল। যারা বাদানুবাদ ও ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে স্বজনদেরকে নিজের দলের লোকদেরকে বারণ করত। কিন্তু কেউ তাদের কথা কানে তুলত না। তবুও তারা একত্রে বসে নিজেদের অদূরদর্শিতার কথা আলোচনা করত। শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করত এবং আফসোস ও আক্ষেপ করত।

আসলে শিয়া-সুন্নি কোন বিষয় ছিল না। বরং উভয় দলের কিছু সন্ত্রাসী ও অজ্ঞ-গোঁয়ার লোকেরাই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করত। যে দ্বন্দ্ব প্রায়ই দাঙ্গার রূপ নিত। প্রধানমন্ত্রী ইবন্ আলকামী জানতেন, যতদিন পর্যন্ত এই ফেতনা, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তার ক্ষমতা থাকবে। আর আমীর-উমারা বা দরবারের অন্য কেউ এদিকে মনোযোগ দিবে না। তারা ভাববে, প্রধানমন্ত্রী আছেন। তিনি তো হুকুমত পরিচালনা করছেন। আমাদের এতে নাক গলানো উচিত হবে না। এ সুযোগে প্রধানমন্ত্রী শিয়াদের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করতেন।

এক দিনের ঘটনা। এক সন্ত্রাসী শিয়া বাজার দিয়ে যাচ্ছিল আর বলছিল, অভিশাপ তাদের উপর যারা আমীরের (হযরত আলী (রাঃ)-এর) হক লুটে নিয়েছে।

এক পৌঢ় শিয়া সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সে তাকে ধমক দিয়ে বলল, কি বাজে কথা বলছ।

সন্ত্রাসী বলল, তবে কি তুমি সুন্নি, যে তোমার এ কথা ভাল লাগছে না? পৌঢ় শিয়া বলল, আমি সুন্নি নই শিয়া, তবে এ ধরনের কথা বলা উচিত নয়। এতে ঝগড়া-ফাসাদ আর সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। সন্ত্রাসী বলল, নিজের পথ ধর। এ কথা বলার তোমার কি অধিকার আছে। পৌঢ় শিয়া চলে গেল। তখন আবার সন্ত্রাসী বলতে লাগল, মসজিদে মসজিদে ঘোষণা করে দাও যে, শিয়াদের আযান থেকে ভিন্ন আযান যেন মসজিদে দেয়া না হয়।

এক সুন্নী বলল, এ ধরনের কথা বলে কেন নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করছ? সন্ত্রাসী বলল, চুপ থাক। জান না, শাসন ক্ষমতা এখন আমাদের হাতে? সুন্নি বলল, শাসন ক্ষমতার গর্বে বাজে কথা বলছ কেন?

সন্ত্রাসী বলল, তোমাদের বুযুর্গদের উপর লানত।

সুন্নী বলল, সাবধানে কথা বল। অন্যথায় থাপ্পর দিয়ে মুখ বাঁকা করে দিব। সন্ত্রাসী তো ঝগড়ার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত। তাই সে সুন্নীকে একটি ঘুষি মারল। সুন্নীও ঘুষির জওয়াব ঘুষি দিয়েই দিল। তখন সন্ত্রাসী সেই শিয়া চিৎকার দিয়ে উঠল। "আমীর আলাইহিস সালামের দোহাই। অভিশপ্তরা আমাকে মেরে ফেলল।"

বাজারের সময় ছিল, তার চিৎকার শুনে কয়েকজন শিয়া দৌড়ে এসেই সুন্নীকে মারতে শুরু করল। কয়েকজন সুন্নীও এগিয়ে এলো। তারাও মারধর শুরু করল। দেখতে দেখতে বিরাট হাঙ্গামা। কয়েকজনের মাথা ফেটে গেল। হাত-পায়ে জখম হল। সারা বাজারে শোরগোল ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেল।

ঘটনাক্রমে সে দিক দিয়েই প্রধানমন্ত্রী মুয়ায়্যিদুদ্দীন ইবন্ আলকামী কোথাও যাচ্ছিলেন। তার দেহরক্ষী একশ' সিপাহীও সাথে ছিল। তারা সবাই শিয়া ছিল। ইবন আলকামী ধমক দিল। সাথে সাথে মারামারি বন্ধ হয়ে গেল। তিনি বললেন, এটা কেমন নিলর্জ্জ আচরণ? সন্ত্রাসী সেই শিয়া দৌড়ে এসে ইবন্ আলকামীর সওয়ারীর পাদানী ঝাপটে ধরল। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, হুজুর! দেখুন এই বদমাশ সুন্নীরা আমাকে মারতে

মারতে রক্তাক্ত করে ফেলেছে। তারা বলছে আমাদের শিয়াদেরকে বাগদাদ থেকে তাড়িয়ে দিবে।

ইবন্ আলকামী ক্ষিপ্ত হলেন। বললেন, সুন্নীদের শুনিয়ে দাও, বাগদাদে শিয়া থাকবে। সুন্নিরা বাগদাদ ছেড়ে চলে যাও।

একজন অত্যন্ত সনামধন্য সুন্নী অগ্রসর হয়ে বলল, এ ধরনের কোন কথা কোন সুন্নী বলেনি। আপনি তদন্ত করুন, এ ফিত্নার কারণ কি?

ইবন্ আলকামী বললেন, আহ্লে বাইতের প্রেমিক মিথ্যা বলতে পারে না। এখানে যে সুন্নীরা আছে, তাদের গ্রেফতার কর।

সিপাইরা সব সুন্নীকে গ্রেফতার করল। ঘটনাক্রমে সেই পৌঢ় শিয়াও এসে পড়ল। যিনি সন্ত্রাসীকে উস্কানীমূলক কথা বলতে বারণ করেছিলেন। বুঝিয়েছিলেন এবং সবকিছু দেখেছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, আমাকে জিজ্ঞেস করুন। এই ব্যক্তিটি, যে আপনার সাওয়াবীর পাদানী ধরে দাঁড়িয়ে আছে প্রথমে সুন্নীদের গালমন্দ করেছে। আমি তাকে বুঝিয়েছি, বারণ করেছি। তখন সে আমাকেও ধমক দিয়েছে।

ইব্নে আলকামী বললেন, তুমি সাদাসিদে মানুষ। এসব কিভাবে বুঝবে? সুন্নীরা ফেতনাবাজ এবং ঘরে আগুন লাগিয়ে না দিলে এরা সত্যকে মানতে নারাজ।

স্বনামধন্য শিয়া বলল, আপনি প্রধানমন্ত্রী। ইনসাফ করুন।

ইবন্ আলকামী বললেন, চুপ কর। আমি ইনসাফই করছি।

সেই স্বনামধন্য শিয়া নীরব হয়ে গেলো। তখন ইবন্ আলকামী সিপাইদের বললেন, এই বদজাত সুন্নীদের টানতে টানতে নিয়ে চল।

সিপাইরা তাদের অত্যন্ত নির্দয়ভাবে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

সন্ত্রাসী বলল, এখন মজা বুঝলে ত।

সেখানে শিয়ারাই বেশি ছিল। তারা বলল, সুন্নীদের জায়গা এখন জেলখানা। কিন্তু কিছু চিন্তাশীল বুদ্ধিমান শিয়াও সেখানে ছিল। তারা বলল, হায়! গৃহযুদ্ধের কারণে তো জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

আবু বকর

সেই কূপের কথা প্রায়ই আহ্মারের মনে পড়ত। সে জানতে চেষ্টা করত, কেন কূপগুলো নির্মাণ করা হয় এবং কেন তা বন্ধ করে ফেলা হল। সে যখন নাজমার সাথে কূপের কথা তুলেছিল তখন নাজমা খুব পেরেশান হয়েছিল। তাই সে বুঝে ফেলেছিল, নিশ্চয় কূপগুলোকে নিয়ে কোন রহস্য আছে। সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য সে অস্থির।

একদিন সে বসে বসে এই চিন্তাই করছিল। ইতিমধ্যে খলীফার উত্তরাধিকারী আবুবকর আসল। আহমার অত্যন্ত উষ্ণতার সাথে তাকে স্বাগতম জানাল। এক মূল্যবান সোফায় বসাল এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করল।

আবুবকরের বয়স অল্প । হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। স্বাস্থ্যবান। চেহারা, বীরত্ব ও দূরদর্শীতার আলামত বিকশিত। সে বলল, মোল্লাজ্বী, কি চিন্তা করছিলে?

আহ্মার রোজা-নামাযের খুব পাবন্দ ছিল। শাহী খান্দানের সবাই তাই তাকে মোল্লাজী বলে ডাকত। সে বলল, আমি এখন চিন্তা করছিলাম যে, নহরের পাড়ে কূপ কেন নির্মাণ করা হয়েছিল আবার কেন সেগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হল।

এ কথা বলার সময় সে আবু বকরের চেহারার দিকে দৃষ্টি রাখছিল। কূপের কথা শুনামাত্র সে পেরেশান হয়ে উঠল। বলল, আল্লাহ্র ওয়াস্তে বলছি, ও কথা ভুলে যাও।

আহ্মার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, তাহলে কি কূপগুলোকে ঘিরে কোন রহস্য লুকায়িত আছে?

আবুবকর বলল, আমি তো বললাম, কূপগুলোর আলোচনা করো না। কেউ জানে না যে, খলীফা কেন তা বানিয়েছেন। কূপগুলো নির্মাণকালীন সময়ে কাউকে সেদিকে যেতেও দেয়নি। সাধারণ লোকেরা কূপের কথা জানেও না। আহ্মার বলল, ভারি বিস্ময়কর কথা।

আবুবকর বলল, বিষয়টি বিস্ময়কর হোক যা হোক, তুমি মুখবন্ধ করে রাখ। শাহী খান্দানের অতি অল্প কয়েকজনই কূপ খননের কথা জানে। আর যারা জানে তাদেরকে মহামান্য খলীফা বলে দিয়েছেন যেন তারা কখনো এর আলোচনা না করে। সুতরাং তুমিও সে কথা ভুলে যাও।

আবু বকর বলল, আমি তোমাকে একটি কথা বলতে এসেছি।

আহ্মার তো বলার সাথে সাথে বলল, বলুন। অন্তরে এক আংশকায় ভীষণ আলোড়িত হচ্ছিল। সে কামনা করছিল, আবুবকর যেন নাজমার ব্যাপারে কোন আলোচনা না করে। সে তার দিকে দেখছিল। আবুবকর কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলল, আমি ইবন্ আলকামীকে বিশ্বাস করিনা।

আহমার বলল, আপকি কি ইবন্ আলকামী সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? একথা বলে আহমার দীর্ঘশ্বাস নিল।

আবুবকর বলল, হ্যাঁ, সে কোন গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

চরম বিস্ময় ঝরে পড়লো আহমারের কণ্ঠে, বলল, ষড়যন্ত্র করছে! আবুবকর বলল, হ্যাঁ, আমার ধারণা তো তাই।

আহমার বলল, শুধুমাত্র ধারণাই।

আবু বকর বলল, হ্যাঁ শুধু ধারণা। তবে ও ধারণাকে নিশ্চয়তার পর্যায়ে মনে করতে পার।

আহ্মার বলল, এমন ধারনা কেন সৃষ্টি হয়েছে?

আবুবকর বলল, আমি তদন্ত করে দেখেছি যে, সে কতিপয় যুবককে ও কিছু নির্বোধ প্রকৃতির শিয়াকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করার জন্য নিযুক্ত করেছে। কারণে অকারণে তারা সুন্নীদের লক্ষ্য করে অকথ্য অশ্রাব্য কথা বলে এবং উভয় দলের মাঝে দাঙ্গার সৃষ্টি করে।

আহমার বলল, কিন্তু তার প্রমাণ কি?

আবুবকর বলল, শুনলাম গতকাল শফীক নামের এক সন্ত্রাসী অকারণে এক বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করল। সেখানে ইবন্ আলকামীও এসে উপস্থিত হল। সে শফীকের পক্ষ নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজনাকর কথা বলেছে। সুন্নিদের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। সেখানে যত সুন্নী একত্রিত হয়েছিল সবাইকে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

এ সব শুনে আহমার বলল, আপনার চিন্তা সঠিক ও ধারণা বাস্তব। এ ঘটনায় শিয়ারাও নির্দোশ সুন্নীরাও নির্দোষ। সবকিছু ঘটাচ্ছে ইবন্ আলকামী নিজে। সে কিছু সন্ত্রাসী লালন করছে। তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। সে যাচ্ছে দেশময় দাঙ্গা ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করতে।

আবুবকর বলল, ইতিপূর্বে আমি মুয়ায়্যিদ্দীন ইবন্ আলকামীর এ ধরনের কর্মকান্ডের কথা শুনেছি। তবে তা সুন্নীদের থেকে শুনেছি। তখন ধারণা করেছিলাম যেহেতু প্রধানমন্ত্রী শিয়া তাই তারা তার বিরুদ্ধে লেগেছে। আমি তাদের কথার তেমন গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু গতরাতে হাসান আসাদ, যিনি অত্যন্ত বুযুর্গ ব্যক্তি; শিয়ারাও তাকে সম্মান করে সুন্নিরাও তাকে সম্মান করে। তিনি এসে আমাকে শফীকের সন্ত্রাসী ও ইবন্ আলকামীর বাড়াবাড়ির কতা শুনালেন। তিনি আমাকে বললেন, তিনি নিজে ইবন্ আলকামীর নিকট শফীকের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের কথা বলেছেন। কিন্তু ইবন্ আলকামী তাকে ধমকিয়ে নীরব করে দিয়েছে।

আহমার বলল, হাজেরা আমাকে বলেছিল, একদিন যে কিছু শিয়া সন্ত্রাসী ফিতনা শুরু করে দিয়েছিল, তখন সে তার পিতাকে তাদের সম্পর্কে বুঝিয়েছিল। আর তার পিতা বলেছিল, আমি তাদেরকে বুঝিয়ে দিবো।

আবুবকর বলল, হাজেরা অত্যন্ত ভাল মেয়ে। আমি জেনেছি যে, ইবন্ আলকামী আমার সাথে তাকে বিয়ে দিতে চায়। সুন্দরী, রূপসী-পরিচ্ছন্ন, হৃদয়। আমি আনন্দের সঙ্গেই তাকে আমার জীবন সঙ্গীনী হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি সে ভাই আহমদ আবুল কাশেমকে ভালবাসে। আর আহমদও তার প্রেমে বিভোর। তাই এখন আমি হাজেরাকে আমার বোন মনে করি।

আহমার বলল, আপনি পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ। শাহজাদী নাজমাও আপনার প্রশংসা করেন।

আবুবকর মৃদু হাসতে হাসতে আহমারের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, আমি জানি, নাজমার মন তোমার দিকেই। তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান। নাজমা অনিন্দ সুন্দরী, বাগদাদের অপ্সরী। যে তাকে একবার দেখেছে সে তাকে ভালবেসেছে। সে তোমাকে কামনা করে আর তুমি ..... অবশ্যই।

আহমার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, পরিস্কার কথা, আমিও তাকে ভালবাসি।

আবুবকর বলল, একথা আমি জানি এবং বুঝি, নাজমা এমন এক রূপবতী সুন্দরী, যাকে হৃদয় অবলীলায় ভালবাসতে চায়।

আহমারের সন্দেহ হল। ভাবতে লাগল, সে যেন তার প্রেমাস্পদের সাথে প্রেম না করে বসে এবং উত্তেজিত হয়ে তাকে ভালবাসতে নিষেধ না করে দেয়। তাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আবুবকর বলল, আমি তোমাকে আমার ভাই মনে করি আহমার! আমি বলতে পারব, এখন তোমার অন্তরে কোন কথাটি ঘোরপাক খাচ্ছে। আমি জানি এখন তুমি

কি চিন্তা করছ। নিশ্চিন্ত থাক। আমি নাজমাকে যন্ত্রণায় ফেলব না। যদিও আমি জানি, আমি চাইলে নাজমার সাথে আমার বিবাহ অত্যন্ত সহজেই হয়ে যাবে। কিন্তু আমি দু'টি মিলিত হৃদয়ের বিচ্ছেদ কামনা করি না।

আহমার কৃতজ্ঞতায় ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কিভাবে আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করব।

আবুবকর বলল, এটা কৃতজ্ঞতা জানানোর কোন বিষয় নয়। আমিও একজনকে চাই।

আহমার বলল, সে সৌভাগ্যের অধিকারিনী কে?

আবুবকর বলল, এক সাধারণ পরিবারের মেয়ে।

আহমার বলল, আপনি তাকে কোথায় দেখেছেন।

আবুবকর বলল, একদিন রাতে আমি দজলার তীরে দাঁড়িয়েছিলাম। জ্যোস্নাভরা রাত। প্রদীপ আর চাঁদের আলোয় দিনের মত মনে হচ্ছিল পুরো জনপদ। ইতিমধ্যে একটি বজরা এসে ভীড়ল। বজরা থেকে এক যুবতী নামল। অত্যন্ত সুন্দরী ও রূপবতী- যেন পরী। আমি তার সৌন্দর্য ও রূপে মোহাবিষ্ট হয়ে গেলাম। আমি তাকে দেখলাম। সেও আমাকে দেখল। তার দৃষ্টির তীর আমার হৃদয়ের মর্মমূলে বিদ্ধ হল। নিকটে তার গাড়ী দাড়ানো ছিল। সে তাতে চড়ে চলে গেল। সারারাত আমাকে সেই বিমুগ্ধকর মেয়ের দৃশ্য কষ্ট দিল। তার কয়েকদিন পরের ঘটনা। আমি একাকী দজলার তীর ধরে কোথাও যাচ্ছিলাম। এক বাগান থেকে মধুর কলকণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসছে। আমি বাগিচার দরজায় পৌঁছলাম। হঠাৎ আমার সম্মুখে এক নারী মূর্তি উপস্থিত। আমি চেয়ে দেখি, এই সেই মোহময়ী যে আমার রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল।

আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। সে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় আমাকে বলল, 'উহু আপনি'! আমার মনে হল যেন ফেরদাউস জান্নাতের হুর আমার সামনে। সে আমার সাথে কথা বলতে শুরু করল। আমার পরিচয় জানতে চাইল। তবে আমি তাকে বলিনি যে, আমি খলীফার উত্তরাধিকারী। তার নাম জিজ্ঞেস করলে বলল, ফেরদাউস। এক জমিদারের কন্যা। আমি তার বাড়ির ঠিকানাও জিজ্ঞেস করে নিয়েছি। এ পর্যন্ত কয়েকবার তার সাথে সাক্ষাৎও হয়েছে।

আহমার বলল,আরে! চমৎকার কাহিনী তো!

আবুবকর বলল, আমার মন চায় আমি তাকে বলে দেই যে, আমি কে? কিন্তু ভয়ের বিষয় যে ও কথা বলতে আমার সাহস হয় না। যদি সে আমার পরিচয় পেয়ে ভরকে যায়!

আহমার বলল,আমার মনে হয়, তার নিকট আপনার ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হওয়া দরকার।

আবুবকর বলল, চেষ্টা করব।

আহমার বলল, একদিন তাকে আপনার শাহী মহলে দাওয়াত দিন।

আবুবকর বলল, যদি তুমি নাজমাকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও তাহলে সে-ই সুন্দরীকে রাজ প্রসাদে নিয়ে আসতে পারবে। ও সময় নাজমা ও আহমদ এসে দাঁড়ালে তারা উভয়ে তাদেরকে স্বাগতম জানায়। (চলবে)

অনুবাদ ঃ নাসীম আরাফাত

শব্দ করে হাসতে মানা

✪ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হামজা সাহেবের বাড়িতে এসেছে খান সেনারা তল্লাশি করার উদ্দেশ্যে। বৈঠকখানায় হামজা সাহেবের দাদার যুবক বয়সের একটা ছবি টানানো ছিল।
একজন পাঞ্জাবী সেনা বলল, এ ছবি কার?
ভদ্রলোক বলল, আমার দাদার ছবি।
খানসেনা অবাক হয়ে বলল, কী আশ্চর্য,
লোকটা এখনও বুড়ো হয়নি?

✪ লালসালু পরে মাজারজীবী এক ফকীর বাবা এসেছেন কালু ব্যাপারীর বাড়িতে। ব্যাপারীর বউকে বললেন, 'মা অনেক দিন পর আমি আবার আজমীর শরীফ যাচ্ছি। ভাবলাম, তোমাদের একটু খবর নিয়ে যাই। সে বার তো তোমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য মাজারে মোমবতি জ্বেলে এসেছিলাম। আল্লাহ্ কি তোমারে দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন?
জ্বি, ফকীর বাবা, (ছোট বড় ছেলে-মেয়ে দেখিয়ে) আল্লাহ্ আমাদেরকে তারপর সাতটি ছেলে-মেয়ে দিয়েছেন।
আলহামদুলিল্লাহ্। তা কালু মিয়াকে দেখছি না যে? কোথায় গেলেন?
জ্বি, উনি আজমীর শরীফ গেছেন আপনার জ্বালানো মোমবাতি নেভাতে।

✪ যুদ্ধাহত রোগী ঃ ডাক্তার সাহেব, এসব বন্ধ করুন। আপনি আমার কাঁচা ক্ষতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জান বের করে ফেলবেন। এ সবের তো কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না।
ডাক্তার ঃ চেঁচাবেন না। বুলেটটা তো বের করতে হবে?
রোগী ঃ ইয়া আল্লাহ্! আগে বলবেন না? ওটা তো আমার পকেটে।

✪ আমজাদ সাহেব রাতের খানা খেয়ে রাস্তায় একটু পায়চারি করছিলেন। অকস্মাৎ দুই যুবক এসে বলল, কিছু মনে করবেন না। একটা সিকি বা আধুলি দিন তো।
পয়সা দিয়ে তোমরা কি করবে? আমজাদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, সে আর বলবেন না। একটি বিষয়ে আমরা মীমাংসায় পৌঁছতে পারছি না। বিষয়টা হচ্ছে, আপনার ঘড়িটা কে নেব। তাই পয়সা দিয়ে একটু টস করে নিতাম আর কি।

✪ মোল্লা নাসিরুদ্দীনকে অপদস্ত করতে গিয়ে অনেকেই অপদস্ত হয়েছে। তবুও এধারা সমাপ্ত হয়নি। একবার কিছুলোক মোল্লাকে বলল, শুক্রবার জুমার নামাযের আগে আমাদেরকে একটু ওয়াজ-নসিহত করে শুনালে খুবই খুশী হব।
অনুরোধ মত মোল্লা জুমার আগে ওয়াজ করার উদ্দেশ্যে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলল, ভাইসব, আপনারা কি জানেন, আমি এখন কি বলব?
সবাই বলল, না, তাতো জানি না। মোল্লা বলল, এটুকুও যদি না জানেন, তাহলে আপনাদের মত অজ্ঞদের ওয়াজ করে কোন লাভ নেই। বলেই মোল্লা বসে পড়ল। নাছোড়বান্দা লোকগুলো আবারও একদিন মোল্লাকে ওয়াজ করার অনুরোধ করল। মোল্লা আবারও একদিন গিয়ে সেই একই প্রশ্ন করল।
এবার সবাই বলল, আপনি কি বলবেন তা আমরা জানি।
মোল্লা বলল, জানা কথা বারবার শোনবার কোন মানে হয় না। বলেই মোল্লা বসে পড়ল।
লোকগুলোর আবার একই অনুরোধ।
মোল্লা পূর্ববৎ মসজিদে হাজির হয়ে একই প্রশ্ন করল। এবার অর্ধেক লোক বলল, জানি এবং অর্ধেক বলল, জানি না। মোল্লা বলল, তাহলে তো ঝামেলা শেষ। যারা জানে না তারা যারা জানে, তাদের কাছ থেকে জেনে নিন। বলেই মোল্লা বসে পড়ল।

✪ ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ একবার এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল ত ট্রাজেডি আর কমেডির মধ্যে পার্থক্য কি?
রসিক ছাত্রের জবাব, স্যার, রাস্তায় পড়ে থাকা কলার খোসায় পা পিছলে আমি ব্যথা পেলে তা হবে কমেডি। আর আপনার বেলায় হবে ট্রাজেডি।

✪ ছেলে ঃ বাবা, আমার ওজন কত হবে?
বাবা ঃ তা পঁচিশ-ত্রিশ সের হবে হয়তো।
ছেলে ঃ সর্বনাশ। তাহলে তো আমার পড়ালেখা বুঝি গেল।
বাবা ঃ পড়ালেখার সাথে ওজনের কি সম্পর্ক?
ছেলে ঃ অংকের স্যার বলেছেন, এক মণ (একমন) না হলে পড়ালেখা হয় না।

সংগ্রহ ঃ আহমাদ আবদাল

টগ্‌বগে এক হিন্দু নওজোয়ানের ইসলাম গ্রহণ ও অবিশ্বাসীদের দুঃসহ জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ এবং তার আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের প্রাণবন্ত এক উপাখ্যান

গঙ্গা থেকে জমজম

মল্লিক আহমদ সরওয়ার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হিন্দুরা ছিল বড় চতুর এবং ষড়যন্ত্রে পাকা। তারা ভাল করেই জানতো যে, মুসলমানদের উপস্থিতিতে তারা আমাকে ধরতে পারবে না। তাই তারা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে আমাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। শুরু হলো আমার ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা।

থানার ওসি প্রথমে আমাকে কোন ভয় নেই, বল তোমাকে কে ফুসলিয়েছে? কে প্ররোচিত করেছে? সেই বদ্‌জাত মুসলমানের নাম বল। দেখবে, আমরা তার হাড্ডি পিষে আটা বানিয়ে ফেলব।

আমি বললাম, "আমাকে আমার মন প্ররোচিত করেছে। আমার প্রতিপালক আমাকে প্ররোচিত করেছেন, সত্য এং বাস্তবতা আমাকে ইসলামের প্রতি প্রলুব্ধ করেছে।"

এক হিন্দু সখেদে বলে উঠল, "ওসি সাহেব! এই নিষ্পাপ বালকটির উপর মোচলমানরা (মুসলমানরা) যাদু করেছে। এসব কথা রামচন্দ্র বলছে না, বলেছে তার ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা কোন 'মুচলমান'।"

থানার ওসি আবার সোহাগভরে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন, "দেখ বেটা! আমরা জানি যে, মোসলেমরা বড় ধূর্ত ও ধান্দাবাজ। তারা বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমাদের ছেলে-মেয়েদের বেওকুফ বনায়। তুমি এখনো ছোট এং সহজ-সরলও বটে। এই কচি বয়সে তুমি ওদের চালাকী বুঝতে পারবে না। যদি ওরা তোমাকে টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে থাকে, তাও আমাদের বল।"

আমি বললাম, "আমাকে কোন মুসলমান টাকা পয়সার লোভ দেখায়নি। আমি ইসলামকে সত্য ধর্ম জেনে এবং বুঝে গ্রহণ করেছি।"

থানার ওসি কোমল স্বরে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলল, "দেখ বেটা! ওই ধান্দাবাজ মুসলমানদের প্ররোচনায় তুমি নিজেকে কঠিন বিপর্যয়ের মাঝে নিক্ষেপ করছ। এদের স্বার্থ হাসিল হওয়ার পর দেখবে, এরা তোমাকে ত্যাগ করে একা ফেলে রাখবে এং তোমার বিপদে-আপদে তারা ফিরেও তাকাবে না। বিপদে সব সময় নিজের মা-বাপ, ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়জনই কাছে আসে। অতএব, তুমি ভগবানের কাছে ক্ষমা চাও। ভগবান হলেন মহান। তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। পন্ডিতজি এবং আমরা সবে মিলে ভগবানের নিকট তোমার ক্ষমার জন্য আর্জি পেশ করবো। যদি ভগবানকে তুমি খুব দ্রুত রাজি না করাও, তাহলে তার ক্রোধ তোমাকে ধ্বংস করে দেবে"।

জবাব দিলাম, "আমি তোমাদের কোন ভগবানকে মানি না। আর তোমাদের কোন ভগবানের সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টির পরওয়াও করি না, ধারও ধারি না আমি। তোমাদের ভগবান তো তার উপর বসে থাকা ক্ষুদ্র মাছিটাকেই তাড়াতে পারে না, "আমার কি ক্ষতিটা করবে?"

আমার দৃঢ়চেতা স্পষ্ট কথাগুলো শুনে ওসি সাহেব চিৎকার দিয়ে বললেন, "ইতর, বদমাশ, হতভাগা কোথাকার! তুই আমাদেরই সামনে আমাদের ভগবানের শানে গোস্তাখী করছিস, তাঁকে অপমান করছিস? আমি তোর হাড্ডি ছাতু বানিয়ে ছাড়ব"।

নির্যাতন শুরু হল। আমাকে মাটির উপর শুইয়ে দেয়া হল। ডান্ডা দিয়ে সজোরে পিটাতে থাকল। সে এক দুঃসহ যন্ত্রণা, অসহনীয় নির্যাতন। আমি মানসিকভাবে এইসব নির্যাতন সহ্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমি জানতাম যে, এখন আমার ঈমানের পরীক্ষার সময়। এটা সেই মহা পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ড, যাতে হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত সোহাইব (রাঃ) এং হযরত খুবাইব (রাঃ)-এর মত মহান সাহাবীগণ পুড়ে পুড়ে খাঁটি স্বর্ণ হয়েছিলেন। ঐ মহা-মনীষীদের ঘটনা জাফর আলী আমাকে শুনিয়েছিল। মক্কার মুশরিকদের জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন আর সাহাবা-ই কেরামগণের ঈমানের দৃঢ়তা ও তাঁদের ইসলামে অবিচল থাকার ঘটনা আমার স্মরণ ছিল। আজ তাঁদের সেই সুন্নত আমার আদায় হচ্ছে। সূরা আন্‌কাবুতে প্রদত্ত আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশের কথাও আমার মনে ছিল, যা আমি কোন এক বই-এ পড়েছিলাম। আল্লাহ্ বলেছেন- "মানুষ কি এটা ধারণা করছে যে, শুধু এতটুকু বললেই তা যথেষ্ট হয়ে যাবে যে, আমি ঈমান এনেছি, আর তাদেরকে কোন পরীক্ষা করা হবে না? অথচ তাদের পূর্ববর্তী সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ্ নিশ্চয় জানেন যে, (প্রকাশ্য ঈমানের দাবীতে) কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী"। (সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত-২)

আমি আমার সত্যবাদীতা প্রমাণ করতে চাচ্ছিলাম। আমি সংকল্প করেছিলাম, এ পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। তাই আমি আমার আল্লাহ্‌র নিকট নির্যাতনে অটল ও দৃঢ় থাকার শক্তি প্রার্থনা করে বললাম ঃ হে আল্লাহ্! আমি দুর্বল, এই সীমাহীন জুলুম আর অত্যাচারের মধ্যে আমাকে অটল রাখ। যেভাবে তুমি আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছ, তেমনিভাবে এখন এর সত্যতার সাক্ষী হবার তওফীক দান কর।"

মক্কার মুশরিকরা যদি ৩৬০ প্রতীমার পূঁজা করে থাকে, তাহলে এখানে মুশরিক, কাফের ও হিন্দুরা শত সহস্র প্রতীমার পূঁজাই শুধু করছে না বরং তারা তো গাভী এং হনুমান নামে পরিচিত বড় বড় বানরকেও দেবতার মর্যাদায় সমাসীন করে রেখেছে। তবে সে যা-ই হোক, একটি বিষয়ে এদের মিল রয়েছে। তা হলো, এরা উভয় সম্প্রদায় জালেম এং এদের ধর্মও ভিত্তিহীন-মনগড়া।

প্রতিটি আঘাতে আমার মুখ দিয়ে আহ্-শব্দের সাথে শুধু বেরুত- "হে আল্লাহ্! আমাকে সাহায্য কর"। আল্লাহ্ শব্দটি শুনে হিন্দুদের লাঠি নতুন প্রাণ পেত, দ্বিগুণ শক্তিতে গর্জে উঠতো। তারা ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে পড়তো এবং প্রচণ্ড শক্তিতে ডান্ডা কষতো। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমি ভয় করছিলাম, পাছে এই আমি যদি শক্তি, সাহস ও উদ্যম হারিয়ে ফেলি! যখনই একটু হুঁশ ফিরে পেতাম, তখনই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালার এই দৃপ্ত উচ্চারণটি আমার মুখে মৃদু গুঞ্জরণ তুলতো ঃ "যারা বলেছে যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক এবং এটা বলে এর উপর দৃঢ় থেকেছে, তাদের উপর ফেরেশ্‌তাগণ অবতরণ করে এবং তাঁদেরকে বলে যে, ভয় পেও না কোন চিন্তাও করো না এবং যে জান্নাত সম্পর্কে তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে, তার

সুসংবাদে আনন্দিত হও। আমি তোমাদের ইহলৌকিক জীবনেও সঙ্গে আছি পারলৌকিক জীবনেও সঙ্গে থাকবো। সেখানে তোমরা যা কিছু চাইবে পাবে, আর যা কামনা করবে, তা হয়ে যাবে। এটা তোমাদের জন্য ঐ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র অবদান, যিনি ক্ষমাশীল এবং অনুগ্রহকারী।" (সূরা হা-মীম আস-সাজদা-৩০-৩২)

এই আয়াতের মাধ্যমে আমি শক্তি যোগাতাম। উপরন্তু সেই নওমুসলিম যুবতীর দৃঢ়তার পরাকাষ্ঠাও আমার সামনে উপস্থিত ছিল যে নারী হয়েও সে জীবন্ত পুড়েছে, তার সুদৃঢ় অবস্থান থেকে এক বিন্দু পিছনে সরে দাঁড়ায়নি। এসব চিন্তা করে আমার সাহস বেড়ে যেতো।

আমার শরীরের উপর দিয়ে বেতের আঘাতের পর আঘাত চলতেই থাকল। আমার আজও স্মরণ আছে যে, যখন তারা আমার পায়ের তলায় ডান্ডা মারতো, তখন আমার কাছে মনে হতো যে, আমার চোখ দু'টো যেন ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে। যদি আমার উপর আমার আল্লাহ্‌র সাহায্য না থাকতো এবং তিনি যদি আমার সহ্যশক্তি ও সাহস না যোগাতেন, মনোবল দৃঢ় না রাখতেন তাহলে হয়তো এই কঠিন পরীক্ষায় আমি নিশ্চিত বিফল হতাম।

মুসলমানরা মামলা দায়ের করল। মেডিক্যাল করার জন্য আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয় যাওয়া হলো। ডাক্তার আমাকে মানসিক রোগী ও পাগল ঘোষণা করলেন। এর উপর ভিত্তি করেই জজ সাহেব মামলা খারিজ করে দিলেন। কেননা ডাক্তার এবং জজ উভয়ই উগ্রবাদী হিন্দু ছিলেন। তাদের নিকট পেশার চেয়ে, আপন কর্তব্যের চেয়ে নিজের মিথ্যা ভগবানের সন্তুষ্টি অর্জন ছিল অধিক কাম্য।

আমাকে দেড় মাস পর্যন্ত কারাগারের অন্ধকার কুঠোরীতে রাখা হলো। যখন আমি কিছু বলতে চাইতাম, তখনই দুই দুইজন কিংবা তিন তিনজন করে হিন্দু পুলিশ আমাকে মারতে শুরু করতো এবং ততক্ষণ পর্যন্ত মার চালিয়ে যেত, যতক্ষণ না আমি আবার বেহুঁশ হয়ে পড়তাম।

অনেক সময় মারের প্রচণ্ডতায় ঘাবড়ে যেতাম, এই ফাঁকে শয়তান আমাকে এই বলে প্ররোচিত করত, "পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে যাও এই ভাল।" এই ব্যাপারটি আমাকে আরও পেরেশান করে তুলতো। আমি আল্লাহ্‌র সামনে অবনত হতাম এবং দোয়ার জন্য হাত উঠাতাম–

ঃ "হে আল্লাহ্! হে প্রতিপালক! আমার হৃদয়কে হিদায়েতের আলোয় উদ্ভাসিত করে আবার (ভুল পথের দিকে) তুমি অন্ধকারে ঠেলে দিও না। তোমার পক্ষ থেকে আমার উপর রহমত বর্ষণ কর। নিঃসন্দেহে তুমিই সর্বদাতা। (আলে ইমরান)

এছাড়া আরও অনেক দোয়া-যা আমার স্মরণে ছিল, তা দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে থাকলাম। সে দোয়াগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে দু'টি উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে ঐ দোয়া, যা বনি ইসরাইল জালেম ফেরাউনের জুলুম থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে চেয়েছিল ঃ

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে জালেমদের জুলুমের প্রয়োগস্থল বানিও না এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের দ্বারা ঐ সমস্ত লোকদের থেকে মুক্তি দাও যারা কাফের।" (সূরা ইউনুস)

দ্বিতীয় দোয়াটিও ফেরাউনের জুলুমের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ ছিল সেই দোয়া, যা ফেরাউনের দরবারে যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র নিকট করেছিল। দোয়াটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ধৈর্যধারণের শক্তি দাও। আর তোমার আনুগত্য স্বীকার করা অবস্থায়ই যেন আমাদের মৃত্যু হয়'। (সূরা আ'রাফ)

দেড় মাস পরে আমাকে হিন্দুদের হাতে তুলে দেয়া হলো। হিন্দুরা আমাকে আমার মা-বাবাকে দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করল। প্রথমে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন এবং পরে হুমকি-ধমকি দিল। কিন্তু আমি ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় হিন্দু হতে কোনভাবেই প্রস্তুত ছিলাম না। শেষ পর্যায়ে এসে তারা আমাকে হত্যাযোগ্য বলে বিবেচনা করল। আমার কাছে আমার পরিণতি ঐ নওমুসলিম মেয়েটির মত হবে বলে মনে হলো। আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, না জানি কেমন কষ্ট দিয়ে দিয়ে আমাকে ওরা হত্যা করবে আবার মনে হতো যে, ঐ নওমুসলিম মেয়ের মত আমাকেও জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে হয়ত। আমি কি সেসব সহ্য করতে পারবো? আবার একাই স্বগতোক্তি করতাম যে, যে আল্লাহ্ এর পূর্বেকার অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, সেই আল্লাহ্-ই আমাকে ভবিষ্যতে কষ্ট সহ্য করার শক্তি ও সাহস যোগাবেন।

আমি হিন্দুদের পিঞ্জিরা থেকে পালাতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু পারলাম না। তারা আমাকে ধরে ফেলল। ভীষণভাবে পেটাল। অবশ্য এই পিটুনী তখন আর আমার জন্য নতুন কোন বিষয় ছিল না। বিগত দেড় দেড়টি মাস ধরে আমার সাথে এই ব্যবহারই করা হচ্ছিল। গোঁড়া ও উগ্রপন্থী হিন্দুরা ক্ষুধার্ত কুকুরের ন্যায় আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কেউ চুল ধরে টানছিল, কেউ মনের ঝাল মিটাতে নানা ভাষায় গলি দিচ্ছিল। সমস্ত আত্মীয়-স্বজন আর অনাত্মীয়দের মধ্যে শুধুমাত্র আমার ভাবী আমাকে ঐ খুনী হিন্দুদের নির্মম থাবা থেকে মুক্ত করার নিষ্ফল চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হচ্ছিলেন। গ্রামের মুসলমানরা ছিল অসহায়। পুলিশের ভয়ে তাঁরা আমাকে কোন সাহায্য করতে পারছিল না।

বহু দূর-দূরান্ত থেকে পন্ডিত, ঠাকুর এবং সাধুরা এসেছিলেন। তারা যে কোন মূল্যে আমাকে হিন্দু বানাতে চাচ্ছিলেন। আমাকে তারা এত মার মারল যে, আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম। যখন হুঁশ আসল, তখন দেখলাম, আমার পায়ে মোটা রশি বাঁধা এবং সে রশি ধরে আমাকে টেনে-হেঁচড়ে শংকর মন্দিরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নিদারুণ পরীক্ষার এই চরম মুহূর্তে মা, বাবা, ভাই, বোন সবাই আমাকে ত্যাগ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং তারাও অন্যান্য হিন্দুদের মত আমার রক্তের নেশায় ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলেন।

তারা অবিরাম আমাকে টেনেই চলছিল। আমার গোটা পৃষ্ঠদেশে মারাত্মক জখম হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞান হয়ে যেতাম, আবার ক্ষণেই জ্ঞান ফিরে পেতাম। জানি না তারা এত কষ্ট দিয়ে দিয়ে আমাকে কেন হত্যা করতে চাচ্ছিল। তারা আমাকে নওমুসলিম যুবতীর মত আগুন দিয়ে কেন জ্বালিয়ে দিল না, যাতে আমি মুহূর্তে জ্বলে-পুড়ে মরে যেতাম। সম্ভবত আশপাশের গ্রামগুলোতে যে সমস্ত শুদ্র এবং কুলীনরা মুসলমান হয়েছিল, তাদের সবার প্রতিশোধ ওরা আমার উপর নিচ্ছিল। আমি এক অসহায় শিকারের মত তাদের হাতের নাগালে এসে গিয়েছিলাম। তারা আমার দেহটাকে চিরে ফেড়ে খাবলে খাবলে নিচ্ছিল। তারা হাতে তালি দিচ্ছিল আর অট্টহাসি হাসছিল। আমার সাথে তারা অন্যান্য মুসলমানদেরকেও অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছিল।

এই জুলুম-নির্যাতনের কল্পনাও আমি করতে পারতাম না, যা ইসলাম গ্রহণ করার 'অপরাধে' আমার উপর চলছিল। কষ্টের আতিশয্যে আমার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। পথ-ঘাটের ইট সুড়কি আর কাটা আমার শরীরে বিদ্ধ হচ্ছিল। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতে লাগলাম ঃ

"হে আল্লাহ্! আমার মৃত্যুকে সহজ করে দাও

এবং আমার জীবনের শেষ মুহূর্তে ঈমানের সাথে থাকতে দাও। হে আল্লাহ্! এই সুঃসহ কষ্ট থেকে আমাকে মুক্তি দা।"

ঐ দুরাবস্থার সময় যখন আমি কালেময়ে তায়্যিবা পড়তাম, তখন আমার স্বর্গীয় প্রশান্তি অনুভব হতো। এমন মনে হতো, যেন আমার কোন কষ্টই নেই।

শংকর মন্দির আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় সোয়া কিলোমিটার দূরে। ঘোসির নিকটবর্তীই আবার নরওয়াল গ্রাম। এই নরওয়াল গ্রাম আর চম্বরিয়া গ্রামের মাঝামাঝি একটি জঙ্গল। এই জঙ্গলের মধ্যে মন্দিরটা। মন্দিরের সামনে একটি পুকুর। পুকুরটি ডোঙ্গা পুকুর নামে পরিচিত। এর এক পাড়ে শ্মশান ঘাট, যেখানে হিন্দুরা তাদের মৃতদের পোড়ায়।

আমার ধারণা হচ্ছিল, এখন ওরা আমাকে এখানে জীবন্ত পোড়াবে। তখন আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের আনন্দে তরঙ্গের মত এক অব্যক্ত বিদ্যুৎ আমার সারা শরীরে বয়ে গেল। আমি আমাকে এই দুনিয়া থেকে বহু দূরের অন্য এক জগতে দেখতে লাগলাম। "মউতের দৃশ্যপট, মৃত্যুর পর কি হবে"? ইত্যাদি যেসব কিতাব পড়েছিলাম, তাতে বর্ণিত একেকটি বিষয় আমার স্মৃতিপটে ভাসতে লাগল। আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দোয়া করতে লাগলাম ঃ "হে আল্লাহ্! জাহান্নাম থেকে আমাকে বাঁচাও, কবরের হিসেব-নিকেশ আমার জন্য সহজ করে দাও। আমাকে প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর শাফায়াত নসীব কর এবং তোমার দিদারের সৌভাগ্য দান কর"।

আমাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে সমস্ত কাপড় খুলে সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হলো এং হলুদ রং-এর ধুতি পড়ানো হলো। ছাই এনে আমার সারা শরীরে মাখান হলো আর কপালে তিলক এঁটে দেয়া হলো। তারা আমার মাথা নেড়ে করে দিল; কিন্তু এক গুচ্ছ চুল টিকি বানিয়ে রেখে দিল। শূকরের দুটা বাচ্চা এনে বলি দেয়া হলো এবং তার রক্ত দিয়ে আমাকে গোসল করানো হলো। এরপর আসলো পন্ডিত মশাই। তিনি শাস্ত্রালোচনা করলেন, রামায়ন পাঠ করতে লাগলেন।

এসব হতে দেখে আমি ভাবছিলাম যে, হিন্দুরা আমাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার পূর্বে তাদের ধর্মীয় প্রথাগুলো পালন করে নিচ্ছে। এই সব প্রথা পালন করতে দেখে আমি আল্লাহ্র নিকট আরজ করতে লাগলাম, "হে আল্লাহ্! এই সব প্রথা-পর্ব আর কুসংস্কারের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি জান যে, আমি এখানে বড় অসহায়, এজন্য আমাকে মাফ করে দাও"।

আমি এসব চিন্তা-ভাবনার মাঝে ডুবে ছিলাম। এর মধ্যেই পন্ডিত সাহেব প্রথা-পর্ব শেষ করেই ঘোষণা দিলেন যে, মুহাম্মদ আলী আবার রামচন্দ্র হয়ে গেছে। এ ঘোষণা শুনে হিন্দুরা আনন্দে নাচতে লাগল। মিষ্টি বিতরণ করা হলো এং হিন্দুরা একে অপরকে মোবারকবাদ জানাতে লাগল।

তাদের এই সিদ্ধান্ত আমার জন্য শুধু অপ্রত্যাশিতই ছিল না; চরম দুঃখজনকও ছিল। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম, আর হিন্দুরা আমাকে যে ধরনের জীবন ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছিল, তা আমার নিকট ছিল সম্পূর্ণ অগ্রণযোগ্য। আমি তো রামচন্দ্র হয়ে আর একটি মুহূর্ত বেঁচে থাকতে চাই না। বরং মুহাম্মদ আলী হয়ে হাজার বার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছিলাম এক পায়ে দাঁড়িয়ে। তাই আমার জীবনের এই মুহূর্তটা আমার জন্য পূর্বেকার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা আর জুলুম-নির্যাতনের চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক ছিল। তাদের খোশ-খবরী এবং আনন্দের অট্টহাসি আমার কানে খঞ্জরের ধার হয়ে বিদ্ধ হচ্ছিল। আমি অধিকক্ষণ ধৈর্যধারণ করতে পারছিলাম না। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিলাম ঃ "এই হিন্দু সমাজ! তোমরা ভাল করে শুনে রাখ, তোমরা আমাকে দ্বিতীয়বার আর হিন্দু বানাতে পারবে না। আমি এক আল্লাহ্কে ছেড়ে দিয়ে পাথরের তৈরি প্রতীমার সামনে মাথা অবনত করতে পারব না। আমি ঘোষণা করছি যে, আমি মুসলমান। আমাকে মুসলমানদের নিকট যেতে দাও।"

এ কথাগুলো বলতেই তারা আবার আমাকে মারতে শুরু করল। সামান্য বিরতি দিয়ে দিয়ে তারা আমাকে মেরে চলল একেবারে রাত পর্যন্ত। রাতে আমাকে মন্দিরের ভেতরে আবদ্ধ করে তালা লাগিয়ে সমস্ত হিন্দুরা যার যার বাড়িতে চলে গেল। মন্দিরের মধ্যে আমাকে বন্দি করতে গিয়ে পন্ডিত সাহেব বললেন ঃ তুমি ভগবানের শত্রু, তুমি ভগবানের ক্ষমতা ও শক্তিকে অস্বীকার কর, তুমি আমাদের দেবতাদের কটু কথা বল, খারাপ বল। আজ রাতে ভগবানের কৃপায় জীন এবং ভূত তোমাকে খাবলে খাবলে খাবে"।

"আমি যদি এখনও রাম চন্দ্রই থাকতাম, তাহলে হয়তবা আমাকে খাওয়া হতো। কিন্তু এক লা-শারীক আল্লাহ্র কসম, আমি এখনো মুহাম্মদ আলীই আছি। আর ঐ সমস্ত ভূত আমার নাম শুনেই হাওয়া হয়ে যাবে"। পণ্ডিত সাহেবের ঐ কথার জবাবে আমি এ কথা বললাম।

মন্দিরের মধ্যে মা কালির ভয়াবহ মূর্তি ছিল। এছাড়াও গণেশ এবং অন্যান্য অনেক মূর্তি উপস্থাপিত হল। গোমাতার মূর্তিও ছিল। রাতের নিস্তব্ধতায় আমি মন্দিরের মধ্যে একা ছিলাম, আর এ ছিল এক ভয়াবহ দৃশ্য। যদি মুসলমান হওয়ার আগে আমাকে এখানে একা থাকতে হতো, তাহলে হয়তো ভয়ের তীব্রতায় মাত্র কয়েক মুহূর্তে মৃত্যুমুখে পতিত হতাম। কিন্তু এখন আমার স্বীয় খোদার প্রতি এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই পাথর আর মাটির মূর্তি আমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এর পরও কিন্তু আমার মনের কোণে ভয় কিছু ছিলই। সে ভয় ছিল এই কারণে যে, ছোট থেকে এই পর্যন্ত ঐ সমস্ত দেবতাদের পূঁজা করে এসেছি এবং জন্মের পর থেকে এদের সম্পর্কে ভিত্তিহীন, মিথ্যা-বানোয়াট শত-সহস্র কল্পকাহিনী শুনেছি। যার একটা প্রভাব তো অবশ্য মনের কোণে এখনো অবশিষ্ট আছে। সম্ভবত ঐ ভয়কে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলার জন্যই আমার আল্লাহ্ আমাকে এখানে আবদ্ধ করিয়েছেন। ঐ ভয়কে দূর করার জন্য আমি সারা রাত আল্লাহ্কে স্মরণ করছিলাম। যে আয়াত এবং দোয়া স্মরণ ছিল, তা পাঠ করছিলাম।

আমার পিঠ মারাত্মক ক্ষত-বিক্ষত ছিল। তাই চিত হয়ে শুতে পারছিলাম না। সমস্ত শরীর জুড়ে জখমের প্রচণ্ড ব্যাথা। এই ব্যাথা আরও প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হচ্ছে। আমি যন্ত্রণায় কোকাচ্ছিলাম। জানি না রাতের কোন্ প্রহরে এবং কিভাবে আল্লাহ্ তায়ালা আরামদায়ক ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আমাকে অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এর পরে সে যন্ত্রণা আর হয়নি, প্রশান্তিতেই রাখলেন।

দ্বিতীয় দিন সমস্ত হিন্দুরা আমাকে জীবিত দেখে হতবাক্ হয়ে গেল। কিন্তু ঐ সমস্ত মূর্তিপূজকদের ভাগ্যে গোমরাহীই লিপিবদ্ধ ছিল। এই জন্য এরা সব কিছু দেখেও সত্যকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এক্ষেত্রে তাদের এটা মেনে নেয়া উচিৎ ছিল যে, মাটি আর পাথরের ভগবান কোন শক্তি বা ক্ষমতার মালিক হতে পারে না এবং মানুষকে কোন ক্ষতিও করতে পারে না। উল্টো তারা বলতে শুরু করল ঃ

"আমাদের ভগবান বড় রহমদিল। তিনি তোমাকে সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য দীর্ঘ সুযোগ দিতে চান। তাই তিনি তোমাকে জিন-ভূতদের থাবা থেকে রক্ষা করেছেন। অতএব, আমরা তোমাকে বলছি যে, যত দ্রুত পার-হিন্দু

মতাদর্শকে দ্বিতীয়বার গ্রহণ কর। আর যদি তা না কর, তাহলে আবার ভগবানের অসন্তুষ্টি তোমাকে পুড়ে ভস্ম করে দেবে"।

আমি তাদের কথা শুনে ঐ দূরাবস্থাতেও না হেসে পারলাম না। পারলাম না এই ভেবে যে, পাথরের তৈরী মূর্তির মাঝেও আবার হৃদয় আছে যে, সে 'রহমদিল' হবে? আমি তাদেরকে বললাম, "তোমাদের এই সব মটি আর পাথরের ভগবান আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে শোন, তোমরা যদি নিজেদের জন্য স্থায়ী শান্তি চাও, জাহান্নামের আগুনে অনন্তকাল জ্বলতে না চাও, তাহলে ইসলাম গ্রহণ কর"।

আমার উপর আবার শুরু হলো নিপীড়ন-নির্যাতন। "আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, এই জালেমদের হাত থেকে উদ্ধার করার মত এখানে আমার কেউ নেই। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মন বলে উঠত যে, আমার আল্লাহ্ তো এই সমস্ত কিছু দেখছেন এবং শুনছেন, আল্লাহ্ তায়ালার চেয়ে বড় রক্ষাকারী আর কে হতে পারে? "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের মাওলা এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী"।

বিগত চব্বিশ ঘন্টা যাবৎ আমি কিছু খাইনি। তারা আমাকে খাবার দেয়ার কোন প্রয়োজনও মনে করেনি। এটা আল্লাহ্ তায়ালার বড় দয়া ছিল যে, তিনি আমাকে ক্ষুধা সহ্য করার শক্তি দিয়েছিলেন। আমার মা-বাবা, ভাই-বোনরা তো অন্য হিন্দুদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আমাকে মেরে ফেলার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। শুধু একজন মাত্র মানুষ তখনও আমার প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি আমার ভাবী, যিনি বাড়ীতেও আমাকে ঐ সমস্ত জালেমদের জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্ট করেছিলেন।

জেল থেকে মুক্ত করার জন্যও তিনি রাত-দিন একাকার করে ফেলেছিলেন। আবার এখনও এই জঙ্গলের মন্দিরে হানা দেয়ার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। পন্ডিত এবং পূজারীদের থেকে আমাকে মুক্ত করার জন্যও তিনি রাত-দিন এক করে ফেলেছিলেন। আবার এখনও এই জঙ্গলের মন্দিরে খানা দেয়ার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি পন্ডিত এবং পূজারীদের হাতে পায়ে ধরে খাবার আনার অনুমতি আদায় করেছিলেন। এর জন্য তিনি কত মিথ্যার আশ্রয়-ই না নিয়েছিলেন। আমার প্রতি তার এই মমত্ববোধের জন্য ভাইয়্যার হাতে পিটুনিও তাকে খেতে হয়েছিল। কিন্তু আমার জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন স্নেহময়ী বোন এবং ভালবাসা ও মমতায় মা'র ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনিই সকাল-বিকাল আমার জন্য মন্দিরে খাবার নিয়ে আসতেন।

মন্দিরের দিন-রাতগুলো আমার নিকট ছিল খুবই কষ্টকর। ক্ষতস্থানের প্রচন্ড ব্যাথা আমাকে দিনে বসতে দিত না আর রাতে দিত না আরামে একটু শুয়ে ঘুমোতে। আমি এই দুরাবস্থার মধ্যে দিন-রাত কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট দোয়া করতাম ঃ

"হে আল্লাহ! তুমি সত্য। ইসলাম সত্য, তোমার রাসূলও (সাঃ) সত্য। হে আমার আল্লাহ! আমার যদি জীবন অবশিষ্ট থেকে থাকে, তাহেল আমাকে এই সমস্ত জালেম কাফেরদের হাত থেকে পরিত্রাণ দাও। আর যদি জীবন বাকী না থাকে, তাহলে শীঘ্র আমাকে তোমার কাছে নিয়ে নাও। কাফেরদের নির্দয় মার আমার এখন আর সহ্য হচ্ছে না।"

আল্লাহ্ আমার দোয়া কবুল করলেন। আমার মাথায় আল্লাহ্ তাআলা একটি বুদ্ধি জাগিয়ে দিলেন যে, আমাকে এখান থেকে রাতে কেটে পড়া উচিৎ।

মন্দির খুব প্রশস্ত ছিল। রাতে এখানে কেউ থাকতো না। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া মুশকিল হলেও অসম্ভব নয়। তবে মন্দিরের দেয়াল অত্যন্ত উঁচু ছিল। আমি সব কিছু নিরীক্ষণ করে পরিকল্পনা করলাম যে, মূর্তির উপর উঠে দীপ মন্ডপ পর্যন্ত সহজেই পৌঁছতে পারব। যদি একটা রশি কোনভাবে পাই, তাহলে সে রশি মূর্তির গলায় বেধে দ্বীপ মন্ডপে রেখে বাইরে ঝুলিয়ে পরে নিরাপদে এ নরকপুরী থেকে বেরিয়ে যেতে পারব।

আমি ভাবী থেকে এই সাহায্য নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। দ্বিতীয় দিন ভাবী আমার জন্য যখন খানা নিয়ে এলেন, তখন আমার সিদ্ধান্তের কথা তাঁকে জানালাম। সিদ্ধান্তের পুরো পরিকল্পনা শুনে তিনি বললেন ঃ "হায়....। তুমি ভগবানের মাথায় চড়ে পালাবে?" কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বললেন যে, আমি আমার ভাইকে এই চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য সব কিছুই করবো।

রাতের খাবার নিয়ে যখন তিনি আসলেন, তখন কোমরে পেচিয়ে একটি রশিও নিয়ে এলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, এই পর্যন্ত আপনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। অন্যদের মত আপনিও আমাকে ছেড়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তা না করে এত সাহায্য যখন করলেন, শেষ বারের মত আরেকটি উপকার করতে হবে। অমুক মুসলমানকে একটু খবর দিবেন যে, আমি আজ রাতে এখান থেকে পালিয়ে আসব। সে আমাকের অমুক পিপুল গাছের নীচে পাবে।

ভাবী আমার এখান থেকে পালানোর পরিকল্পনায় আনন্দিতও হলেন আবার দুঃখিতও হলেন। তিনি চলে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে দুঃখ বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, "রাম চন্দ্র!"

আমি বললাম, "না ভাবী! আমার নাম মোহাম্মদ আলী।"

"ঠিক আছে, মোহাম্মদ আলীকেই বলছি। তুমি আমার সহোদর ভায়ের চেয়েও প্রিয়। আমার খুব দুঃখ লাগছে যে, তুমি এখান থেকে চলে গেলে সারা জীবনে তোমাকে হয়ত আর দেখতে পাব না। কিন্তু তোমার উপর এখানে যে অত্যাচার চলছে, তা দেখেও আমি সইতে পারি না। তুমি যতখানি জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছো, আমার হৃদয়েও ততখানি ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। রাতভর আমি তোমার জন্য কেঁদেছি। আমি তোমার ভাই, মা, বাবা সবাইকে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা কোন কিছুই শুনতে চান না। তুমি এখান থেকে চলে গেলে তোমার কথা আমার সারাক্ষণ মনে পড়বে। তবে আমি এতটুকু সান্ত্বনা পাব যে, তুমি এই সীমাহীন নির্যাতন থেকে মুক্ত রয়েছো। আমি প্রার্থনা করি, তুমি যেখানেই যাও ভগবান যেন তোমাকে ভাল রাখেন, সুখে রাখেন, শান্তিতে রাখেন।"

আমি ভাবীকে বললাম, "ভগবান নয় ভাবীজান, আল্লাহ বল।" তখন তিনি হেসে বললেন ঃ "ঠিক আছে আল্লাহ-ই বললাম।"

এতটা স্নেহময়ী যে ভাবী, সে ভাবীকে ছেড়ে যেতে আমারও বড় দুঃখ হচ্ছিল। তিনি যখন চলে যচ্ছিলেন, তখন আমি ভাবলাম যে, তার এই অসামান্য সাহায্যের জন্য তাঁকে কমপক্ষে ধন্যবাদ জানাতে হয়। আমি আওয়াজ দিয়ে তাঁকে ফিরে আসার জন্য ডাকলাম এবং বললাম, "ভাবীজান। আমার এই দুর্দিনে যখন মা-বাবা এবং ভাই-বোনরা সবাই আমাকে ত্যাগ করেছেন, তারা আমার রক্তের পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছেন, তখন আমার পাশে আছেন শুধু আমার আল্লাহ আর আছ তুমি। আমি বলতে পারছিনা যে, কী ভাষা দিয়ে আমি তোমার এই ত্যাগের কৃতজ্ঞতা জানাব। আমি তোমার এই স্নেহ, মায়া ও নির্মল ভালবাসার কথা জীবনের শেষ নিঃশাস পর্যন্তও ভুলতে পারব না। আমার জন্য তুমি যে পরিমাণ মার খেয়েছো এবং দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছো, আমি তোমার সেই ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারবো না।"

আমি লক্ষ্য করলাম যে, ভাবীর দু'চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছে, সে অশ্রুতে চোখের দু'কোন ভিজে উঠেছে। ভেজা চোখ তিনি আঁচল দিয়ে মুছলেন। আমার চোখেও পানি এসে গিয়েছিল। তিনি হয়ত কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু তাঁর সে আওয়াজ দীর্ঘ তপ্ত নিশ্বাস আর কান্নার গোমকে আটকে গেল। আবেগের বাষ্পোচ্ছ্বাসে তিনি দৌড়ে দৃষ্টি সীমায় হারিয়ে গেলেন।

দেবী কালি মা'র পাথরের লম্বা জিহ্বা বেরিয়ে আছে। আমি তার জিহ্বায় রশিটি ভাল করে বাঁধলাম।

পালাবার সমস্ত আয়োজন-প্রয়োজন শেষ করেছি। এমন সময় হঠাৎ আমার মাথায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা মনে পড়ে গেল। যখন শহরের সমস্ত মানুষ মেলায় চলে গেল, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মন্দিরে গিয়ে কোন মূর্তির মাথা উড়িয়ে দিলেন, আবার উড়িয়ে দিলেন কোনটার কান, কোনটার নাক আবার কোনটার হাত। আমি ভাবলাম, এত বড় সুযোগ পেয়েও এই মন্দিরের মূর্তিদেরও ঐ অবস্থা না করে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুন্নত আদায়ের অসীম সওয়াব হাসিল করা থেকে কেন বঞ্চিত হবো?

আমার সারা অঙ্গ আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ছিল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও কোন চিকিৎসা না করায় ক্ষতস্থানগুলোর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়েছিল। প্রচণ্ড ব্যাথায় চিন চিন করছিল সারা শরীর। কিন্তু এ সত্ত্বেও সুন্নতে ইব্রাহীমকে পুনর্জ্জীবিত করতে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি মন্দিরে লাগিয়ে রাখা মূর্তির ছবিওয়ালা পোস্টারগুলো ছিড়ে ফেললাম। একটা ইট হাতে নিয়ে মূর্তিগুলোর চেহারা বিকৃত করে দিতে শুরু করলাম। কোনটার নাক, কোনটার কান, আবার কোনটার মুখ ভেঙ্গে দিলাম।

দূরের পল্লীতে মোরগের ডাক শোনা গেল। সময় অনুমান করে রশি ধরে দেয়াল টপকিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়লাম। মুসলমান ব্যক্তিটি পিপুল গাছের নিকটে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমার পরণে ছিল মাত্র একটা ধুতি। আমার উপর ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে কিঞ্চিত তাকে অবহিত করলাম। সে আমাকে তাঁর গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে জৈনপুরের "রিয়াজুল উলুম"-এর দিকে ছুটে চলল।

জৈনপুর আমাদের গ্রাম থেকে ১০০ কিলোমিটার দূর। মাওলানা আব্দুল হালীম সাহেব রিয়াজুল উলুমের মুহতামিম। আমরা ক'দিন পর্যন্ত তাঁর কাছেই থাকলাম। এরপর তাঁর নির্দেশেই আবার বোম্বের দিকে যাত্রা শুরু করলাম।

বোম্বের হাজী শামছুদ্দিন সাহেবের কাছে গিয়ে উঠলাম। তিনি আমাদের গ্রামের লোক এবং প্রতিবেশী। হাজী সাহেব দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। বোম্বে তিনি বড় ব্যবসায়ী, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রথম সারির একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আবার মদনপুরের তায়্যিবা কলেজ পরিচালনা কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী।

আমি দারুণভাবে আহত ছিলাম। আমাকে অনতিবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করান হল। অপারেশন করে আমার পিঠের চামড়ার ভেতর থেকে অনেকগুলো ইট-শুড়কি এবং কাঁটা বের করা হলো, যা হেঁচড়ানোর সময় পিঠে বিঁধে গিয়েছিল। ছয় মাস নাগাদ আমি একটানা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলাম। এ সময় আমার খতনাও সম্পন্ন হয়েছিল।

হাজী সাহেবের নিকট প্রায় একটি বছর অবস্থান করলাম। এরপর আমাকে দারুল উলুম এমদাদিয়া বোম্বেতে ভর্তি করিয়ে দেয়া হল। এখানে আমি তিন বছর ছিলাম। এই তিন বছরে প্রাথমিক উর্দু, দেখে কুরআন শরীফ পাঠ করা এবং প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা পর্যন্ত পৌঁছুলাম।

এই সময়ে আমার ভাবীর কথা বেশ মনে পড়তে লাগল। কিন্তু শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারছিলাম না। এমন সময় খবর পেলাম যে, আমার পরিবারের লোকজন আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেননা আমাকে দ্বিতীয়বার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার খায়েশ তাদের অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম হাজী সাহেব বোম্বে থেকে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। তার নিকট ভাবীর উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে দিলাম এবং হাজী সাহেবকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিলাম যে, এ খবর যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও টের না পায়।

কে জানে কেমন করে বাড়ির মানুষ আমার খোঁজ জানতে পারল এবং আমাকে ধরার জন্য গ্রামের অন্য ক'জন হিন্দুকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বে এসে উপস্থিত হলো। তাদের অনুরোধে মাদ্রাসায় এবং হাজী সাহেবের বাসায় বারংবার পুলিশ চক্কর দিতে শুরু করল। এই অবস্থা দেখে হাজী সাহেব অন্যান্য আলেমদের সাথে আমার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। কোন একজন পরামর্শ দিলেন যে, আমাকে সৌদি আরব পাঠিয়ে দেয়া হোক। কেউ বা বললেন ইরান পাঠাতে। শেষ সিদ্ধান্ত হলো পাকিস্তানে পাঠানোর। সেখানেই নাকি নিরাপদে থাকা যাবে। পাকিস্তানই যাওয়া হলো।

এরপর এক পর্যায়ে আফগানিস্তানের জিহাদের প্রতি আমার মন দারুণভাবে আকৃষ্ট হলো এং জিহাদের ময়দানে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। জিহাদে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তীব্রতর হতে লাগল।

সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্যই ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে আমি আফগানিস্তান সফরে যাই। পাকতিয়া প্রদেশের আল-ফাতাহগঞ্জের অদূরবর্তী ফয়েজ পোস্টে অবস্থান করলাম। সরফরাজ সাহেব ছিলেন আমাদের কমান্ডার। আমি এখানে ১৬ দিন কাটালাম। এই অল্প সময়ে আমি আগ্নেয়াস্ত্রের প্রাথমিক ট্রেনিং সম্পন্ন করলাম এবং যাত্রী ছাউনীতে আক্রমণে অংশগ্রহণ করলাম। দ্বিতীয় দফায় জমিয়াতুল মুজাহিদীনের আমীরের সাথে খোস্ত এলাকার নিকটবর্তী 'বাড়ি' এলাকায় গিয়েছিলাম। এখানে এক সপ্তাহ থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণও করি। ঐ লড়াইয়ে ভয়ংকর এক বোমা বিস্ফোরণে কমান্ডার সাহেবের বাম পা উড়ে যায়। রক্তের ফোয়ারা বইতে শুরু করে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ঐ মুজাহিদ বান্দা তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমাদেরকে জিহাদের তালকীন দিচ্ছিলেন। আধা ঘন্টা পরেই তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। ঐ হামলায় আব্দুস সাত্তার মুলতানী নামের আরেক মুজাহিদের পা মারাত্মকভাবে আহত হয়। হাঁটু পর্যন্ত কেটে ফেলার নির্দেশ হলো। তখন তিনি নিজেই সামান্য ঝুলে থাকা পায়ের টাখনু এক ঝটকায় ছিড়ে ফেললেন। সময় মত সাহায্যকারী ডাক্তার পাওয়া গেল না। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তিনিও শাহাদাত বরণ করলেন।

আমি পাকতিয়ার উরগুন ও খোস্তের নিকটবর্তী এলাকায়ও গিয়েছিলাম। 'বাড়ি'তে কমান্ডার খালেদও আমার সামনেই শহীদ হন এবং খালিদ মাহমূদ ও আব্দুর রহমান নামের আল্লাহ্‌র দুই মুজাহিদের পা কাটা যায়।

আমি যতবারই আফগানিস্তান গিয়েছি, প্রতিবারই আমার প্রবল আগ্রহ ছিল যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন আমাকে শাহাদাতের পেয়ালা পান করিয়ে সৌভাগ্যবান করেন। কিন্তু মনে হয় আমি নিজেকে এখনও শহীদ হবার যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারিনি। (সমাপ্ত)

অনুবাদ ঃ নকীব আশরাফ

সাহাবা জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়

নাসীম আরাফাত

কিশোরদের জিহাদ

ধূলিঝড় উড়িয়ে মক্কা থেকে শসস্ত্র এক হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী এগিয়ে আসছে। জিঘাংসার অগ্নিস্ফূলিঙ্গ তাদের চোখের তারায় তারায়। তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে তারা। তাদের ইচ্ছা, মুসলমানদের নির্মূল করবে। অরক্ষিত শহর মদীনাকে ধ্বংস্তুপে পরিণত করবে। মক্কার সর্দার, সাক্ষাৎ ইবলিসের দোসর আবু জাহেল ইবনে হিসাম তাদের সেনাপতি।

বাতাসের পিঠে চড়ে সংবাদটি চোখের পলকে গোটা মদীনায় ছড়িয়ে পড়ল। নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার কানে কানে গিয়ে পৌঁছল। শিশু কিশোররাও শুনল। সবার মুখে মুখে এ খবর। নানা জল্পনা-কল্পনা এসে এ সংবাদে যোগ দিল। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও কারো চেহারায় কোন ভয়, কোন ভীতি, কোন আতঙ্কের চিহ্ন নেই। মদীনার লোকেরা মৃত্যুকে ভয় করে না। বরং মৃত্যুর সন্ধানে ছুটে যায় তারা। পরম উল্লাসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। মৃত্যুর অমীয় সুধা পানে তারা পাগলপারা। কারণ এই মৃত্যু সেতুর অপর তীরেই তো মুমিনের গন্তব্য। চোখ বুজে একবার সেই মৃত্যু-সেতু পাড়ি দিলেই ব্যস, আর কোন চিন্তা নেই। আর কোন কষ্ট নেই। আর কোন ঝক্কি-ঝামেলা নেই। সেখানে রয়েছে আল্লাহ্র চির সান্নিদ্ধ, হুর-গেলমান, আর অফুরন্ত আনন্দ। আরো কত কি?

তাই মদীনার কিশোর-বালকদেরও আজ আনন্দের শেষ নেই। উল্লাসের কমতি নেই। কারণ রাসূল (সাঃ)-এর অদূরে দাঁড়িয়ে তারা যুদ্ধ করবে। আল্লাহর দুশমনদের শিরে আঘাত হানবে। বাতিলের কণ্ঠ চির স্তব্ধ করবে। হকের আওয়াজ বুলন্দ করবে। বুকে তাদের অনন্ত আশা। চোখে তাদের রঙিন স্বপ্ন। চলাফেরা আর পদক্ষেপে বীর বীর ভাব। জিহাদের ডাকে তারাও ছুটে এলো। হাতে তলোয়ার। পিঠে তীরাধার। চোখে শাহাদাতের অনন্ত পিয়াসা।

কারো কাছে বলা নেই। কারো কাছে কওয়া নেই। এসেই মসজিদে নববীর চত্বরে সাহাবীদের সারির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ল। জিহাদে তারা যাবেই। যুদ্ধ তারা করবেই। এমন একটি বিশ্বাস এমন একটি ভাব তাদের চোখে মুখে ওষ্ঠাধরে।

রাসূল (সাঃ) বাইরে বেরিয়ে এলেন। তিনি আজ অন্য বেশে। অন্য পোশাকে। একজন বীর সেনাপতির বেশে। মাথায় শিরস্ত্রাণ। হাতে ঢাল-তলোয়ার। মুখভাব দারুণ কঠিন। আঘাতে আঘাতে তিনি আজ বাতিলের শিরকে অবনমিত করবেন-ই। এই তার প্রতিজ্ঞা। দৃঢ় তার পদক্ষেপ, রহস্যময় তার চাউনী। কঠিন তার হৃদয়।

মসজিদে নববীর চত্বর, চারদিকে থমথমে পরিবেশ। কোন সাড়া শব্দ নেই। নীরব নিস্তব্ধ। রাসূলের দৃষ্টি এক পলকে চার দিক ঘুরে এল। নিখুঁত সন্ধানী দৃষ্টি। সেনাপতির সতর্ক দৃষ্টি। সারির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চোখ বুলালেন। সাহাবীদের হৃদয়ের প্রতিজ্ঞা, স্পৃহা, আর জিহাদের জযবা অনুভব করলেন। তার মাথাটি একটু দুলে উঠল। বললেন, হ্যাঁ এদের নিয়েই জিহাদে যাব। ঈমানের আলোয় উজ্জ্বল এদের হৃদয়। শাহাদাতের তামান্নায় অস্থির এদের অন্তর। এরাই আল্লাহর প্রতিশ্রুত বাহিনী। এরাই আল্লাহর রাহের সৈনিক।

পরক্ষণেই রাসূল (সাঃ)-এর চেহারা আনন্দে আলোকময় হয়ে উঠল। যেন দিবসের আগমনী বার্তা নিয়ে পূর্বাকাশ সুবহে সাদেকের আলোয় ফকফক্ করে উঠেছে। বিস্ময় বিমুগ্ধতায় যেন তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন। আচ্ছা, কিশোর-বালকরাও বুঝি জিহাদে যাবে! ঐ তো সারির ফাঁকে ফাঁকে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। এরা তো শক্ত করে তলোয়ারও ধরতে পারে না। আহ্ কি নির্মল পবিত্র এদের মন। কি কুসুম-কোমল এদের হৃদয়। নব কিশলয়ের কচি কান্ডের মতই তো এদের শরীর। তবুও আকাশ ছুঁই ছুঁই এদের আশা। ইস্পাত-কঠিন এদের প্রতিজ্ঞা। এরা বাতিলের উদ্ধত শিরকে পদানত করবে। ইসলামের বিজয় ঢংকা নিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

কিন্তু এখনো যে এদের সময় আসেনি। এরা তো ভবিষ্যতের সৈনিক। এরা অনাগত দিনের দুর্দম নির্ভিক সৈনিক। এরা রিজার্ভ ফোর্স। ভবিষ্যতে এরা ইসলামের মানচিত্রকে সুদূর দিগন্তে নিয়ে যাবে। শান্তির অমীয় বাণী প্রচার করবে পৃথিবীর সব দেশে। চির শৃঙ্খলিত মানবতাকে মুক্ত করবে। স্বাধীন করবে।

রাসূল (সাঃ) পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন। কিশোরদের কাছে ডাকলেন। খুব আদর করলেন। সে আদরে কোন খাঁদ নেই। কোন খুঁত নেই। মুঠি মুঠি স্নেহ-মমতা তাদের মাথায় ঢেলে দিলেন। মায়াময় মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, তোমরা তো এখনো অনেক ছোট। আর জিহাদ তো বড়দের কাজ। বড়রা জিহাদ করবে। যুদ্ধ করবে। তোমরা বড় হলে তোমাদেরকেও জিহাদে নিয়ে যাব। যুদ্ধে নিয়ে যাব -----।

রাসূল (সাঃ)-এর কোমল মোলায়েম কথাগুলো তাদের কচি হৃদয় আলিঙ্গন করল। তারা তাদের মাথা দুলালো, সত্যই তো আমরা অনেক ছোট। তলোয়ার নিয়ে জিহাদের শক্তি আমাদের নেই। তাহলে বড় হলেই আমরা রাসূলের সাথে জিহাদে যাব।

প্রত্যাশার ঝলমলে আনন্দ রেখা তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠল। তারা আবার যার যার বাড়িতে ফিরে চলল। এখন হরিণ ছানার মত উল্লসিত, আনন্দিত, উৎফুল্ল তারা। কেননা রাসূল (সঃ) তাদের বলেছেন, তোমরাই আগামী দিনের সৈনিক, সিপাহসালার। আনন্দে উতলা তাদের মন-প্রাণ।



● হাফেজ মোঃ আব্দুল্লাহ
দত্তরাইল নয়পর্বপাড়া মসজিদ
গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

প্রশ্ন ঃ নামাযের মধ্যে ইমাম সাহেবের অজু ভেঙ্গে গেছে। এই অবস্থায় কোন 'মাসবুক' ব্যক্তিকে-যে এক বা দু' রাকাত নামায হয়ে যাওয়ার পর জামাতে শরীক হয়েছে– ইমাম বানান যাবে কি? যদি এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানান বৈধ হয়, তবে সে নিজে কোন্ নিয়মে বাকী নামায আদায় করবে।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মাসবুককেও ইমামের স্থলাভিষিক্ত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মাসবুক ব্যক্তি ইমামের অবশিষ্ট নামায শেষ করতঃ সালামের পূর্বে অন্য একজনকে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করবে, যিনি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন ও মুক্তাদীর নামায শেষ করাবেন, অতঃপর ঐ মাসবুক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার অবশিষ্ট নামায শেষ করবেন।

উল্লেখ্য, ইমামের প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরো নামায পেয়েছে এমন ব্যক্তিকেই খলীফা নিয়োগ করা উত্তম।

১। ফাতাওয়া হিন্দিয়া–১/৯৬
২। আদ্দুররুল মুখতার–১/৬১০

● মুহিব্বুল্লাহ
বাঁশখালী, কক্সবাজার।

প্রশ্ন ঃ যদি কোন ব্যক্তি রমজানে ফিতরা না দেয়, তবে রমজানের পরে ফিত্‌রা দিলে তা আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ ঈদগাহে যাবার পূর্বেই ফিৎরা আদায় করে দিতে হয়। কেউ যদি ঐ সময়ের মধ্যে আদায় না করে, তবে পরে আদায় করলেও তা আদায় হয়ে যাবে।

১। ফাতাওয়া হিন্দিয়া–১/১৯২
২। আদ্দুররুল মুখতার–২/৩৫৮

● মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সুজাতপুর জামে মসজিদ
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

প্রশ্ন ঃ নবিজী (সাঃ) নাকি নামাজে ভুল করার পর সাহু সেজদা দিয়েছেন। নামাজের মধ্যে আমাদের ভুল হলেও নকি এ কারণে সাহু সেজদা দিতে হয়। আসলে বিষয়টা কি?

উত্তর ঃ রাসূলে কারীম (সাঃ) নিজেই একটি ভুলের কারণে এক নামাযে সিজদায়ে সাহু করেছিলেন একথা হাদীসের কিতাবে উল্লেখ আছে। হয়তো বা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের সিজদায়ে সাহুর তরীকা শেখানোর জন্যেই তাঁর প্রিয় রাসূলের দ্বারা এমনটি করিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঐ আমল এবং আরো দু' একটি হাদীসের ভিত্তিতে উম্মতে মুহাম্মদীকে নামাযে ভুল করার কারণে সেজদায়ে সাহু দিতে হয়।

সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং–১০৩৪,৩৫

● মোঃ আব্দুল মান্নান পলাশ
কুড়িকুনিয়া পূর্বধলা, পলাশ, নেত্রকোনা।

প্রশ্ন ঃ এক লোক একবার বন্ধুদের সাথে তামাশা করে বলে ফেলেছে, 'আমি যে সময় যে মেয়েকে বিবাহ করব, ঐ সময় ঐ মেয়েকে তালাক।' এখন জিজ্ঞাসা হচ্ছে, এই লোক বিবাহ করলে তার বিবাহবন্ধন অটুট থাকবে না বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ লোকটি বিবাহ করলেই তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। যদি সে এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ চায়, তবে বিবাহের পূর্বের কোন নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া বিভাগে গিয়ে তার নিয়ম জেনে নিবে।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া–১/৪১৫)

● মোঃ মাহমূদ করীম
কক্সবাজার।

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি সেহরী খাওয়ার পর ঘুমিয়ে গেলে তার স্বপ্নদোষ হয়। উঠে দেখে সোবহে সাদেক হয়ে গেছে। এখন সে কিভাবে গোসল করবে? গোসল করার সময় কিভাবে গলায় গড়গড়া করবে? গড়গড়া করার সময় যদি গলার মধ্যে পানি ঢুকে যায়? আর গলায় পানি ঢুকে যাওয়ার আশংকায় সে যদি গড়গড়া না করে তবে তার গোসল সম্পূর্ণ হবে কি?

উত্তর ঃ রোযাদার ব্যক্তির জন্য ফরয গোসলেও গড়গড়া করা জরুরী নয়, সুতরাং এসব ক্ষেত্রে গড়গড়া ছাড়া কুলি করেই গোসল সেরে নিবে।

(–ফাতাওয়া হিন্দিয়া–১/১৯৯)

● মোঃ কেফায়েত উল্লাহ এলহামী
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন এলাকায় দেখা যায়, মানুষ মারা যাবার পূর্ব মুহূর্তে তাকে তাড়াতাড়ি মাটিতে নামান হয়। মরণাপন্ন ব্যক্তিদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত কি? এসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের সম্পর্কে আপনাদের ধারণা থাকলে দু' কলম লিখে জানালে উপকৃত হব। এ সম্পর্কে শরয়ী ফয়সালাও জানাবেন বলে আশা করি।

উত্তর ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মাটিতে নামিয়ে ফেলার কোন নির্দেশ শরীয়তে নেই, এটি নিতান্তই মনগড়া কুসংস্কার, সুতরাং তা অবশ্যই বর্জনীয়।

● মোঃ আমীরুল ইসলাম
মির ওয়ারিশপুর, নোয়াখালী।

প্রশ্ন ঃ দাড়ি ঘন ও মোটা হয়ে ওঠার নিয়তে দাড়ি গজানোর প্রথম দিকে তা কামান জায়েজ হবে কি?

উত্তর ঃ না, কোন অবস্থাতেই দাড়ি কামানো জায়েয নেই। দাড়ি মোটা বা ঘন করা বান্দার দায়িত্ব নয়, সুতরাং এ অপ্রয়োজনীয় কাজ করতে গিয়ে দাড়ি কামানোর গুনাহ্ কাঁধে নেয়ার মানেই হয় না।

১। কিতাবুল আসার–পৃঃ ৩৭৯
২। আদ্দুররুল মুখতার–৬/৪০৭

● **মোঃ শাহজাহান সিরাজী**
কোটেরবাড়ী, সেনবাগ, নোয়াখালী।

***প্রশ্ন ঃ** কোন ইমাম যদি গায়রে মাহরামের সাথে পর্দা না করেন, তবে তার পিছনে নামায পড়লে সহীহ হবে কি?*

উত্তর ঃ পর্দার বিধান মানা ফরয, যে ইমাম তা রক্ষা করেন না, তিনি শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসেক। আর ফাসেকের পিছনে নামায পড়া মাকরুহে তাহরীমী।

১। সূরা নূর-৩০
২। ফাতাওয়া শামী-১/৫৫৯

● **মোঃ শফী উল্লাহ**
লোহারগেট, খুলনা।

***প্রশ্ন ঃ** পাগড়ির ঝুল কাঁধের উপর থেকে এনে বুকের কোন এক পাশে ঝুলিয়ে নামায পড়ায় কোন সমস্যা আছে কি? এবং ডবল পাগড়ি বাঁধার বিষয়ে শরীয়াতের হুকুম কি?*

উত্তর ঃ পাগড়ীর শিমলা পিছনের দিকেই রাখবে অথবা শিমলা ছাড়াই পাগড়ী বাঁধবে। সামনের দিকে বুকের উপর তা ঝুলিয়ে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। (শরহুল মাওয়াহেব ৬/২৭৭)

একাধিক পাগড়ী এক সাথে পরিধান করার কোন বিধান শরীয়তে নেই।

● **মোঃ আদম ছফিউল্লাহ**
চৌগাছা, যশোর।

***প্রশ্ন ঃ** দেশ ও সমাজের কোন্ পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরজে আইন হয়?*

উত্তর ঃ যখন কাফের গোষ্ঠি দ্বারা মুসলিম এলাকা আক্রান্ত হয় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সকল মুসলমানকে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়, তখন জিহাদ ফরযে আইন হয়।

১। আদ্দুররুল মুখতার ৪/১২৬-১২৭
২। ফাতাওয়া হিন্দিয়া-২/১৮৮
৩। আল বাহরুর রায়েক ৫/৭২

● **আব্দুল্লাহ আল-মমুন**
উল্লাখালী, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।

***প্রশ্ন ঃ** অনেক আলেম মীলাদ ও কেয়াম করেন। অনেকে আবার একে বেদআত বলে এ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। কোন্টি সঠিক। দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।*

উত্তর ঃ রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর জীবনী আলোচন করা, সে মোতাবেক জীবন গড়া এং যথাসম্ভব বেশি বেশি তাঁর উপর দরুদ পড়া সকল মুসলমানের কর্তব্য। কিন্তু প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামের কোন ভিত্তি কুরআন হাদীসে নেই। সাহাবা, তাবেঈন তাবে তাবেঈন তথা স্বর্ণযুগে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং এটি একটি মনগড়া রুসম, যা বর্জনীন।

১। তারিখে মীলাদ
২। জাওয়াহিরুল ফিকহ্

● **অজিউল্লাহ**
ছাদুল্লাপুর, নোয়াখালী।

***প্রশ্ন ঃ** কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত মসজিদের টাকা ব্যয় করার পর আবার তা জমা করে রাখার ব্যাপারে শরীয়াতের হুকুম কি?*

উত্তর ঃ মসজিদের টাকা এভাবে ব্যবহার করা জায়েয নেই। তেব জমা করে দেয়ার দ্বারা তার দায়িত্ব আদায় হয়েছে। এখন উক্ত কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমা চাইবে।

ফাতওয়া শামী-৪/৩৫২

● **মোঃ আকবর খান জুয়েল**
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন ঃ আমি দু'টি পত্রিকায় একটি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে ভিন্নতার ফলে পাঠক মহলে বিভ্রান্তি ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

আমার প্রশ্ন ছিল ঃ

***প্রশ্ন ঃ** অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফেরদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের জিহাদ করার জন্য কারণবশতঃ পনের দিনের বেশী থেকে জিহাদ করলে নামাজ কসর করতে পারবে কি না।*

আর তাবলীগ জামাতে যারা চিল্লা দিতে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় এবং এক মসজিদে তিন দিন করে থাকার নিয়ত করেন, তারা নামাজ কসর করবেন কি না? আরবী, বাংলা ও ইংরেজী, মাইলে তারতম্য আছে। এখন আমরা কত মাইল সফর করার পর কসর নামাজ পড়ব?

এর উত্তরে একটি পত্রিকা লিখেছে ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের সৈনিক বা মুজাহিদরা যদি কোন কাফের রাষ্ট্রে জিহাদ করার জন্য যায় অথবা নিজ দেশে কোন বিদ্রোহী এলাকাকে ঘেরাও করে রাখে, এমতাবস্থায় তারা যদি পনের দিন বা তার চেয়ে বেশী থাকার নিয়ত করে তবুও তারা মুসাফির থাকবে। কেননা তারা অবস্থান এবং পলায়নের মর্ধবর্তী অবস্থায় দিন অতিবাহিত করে। (শামী ১/৫২৯ পৃঃ)

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী শরীয়তের ভাষায় যে ব্যক্তি তিন মনজিল বা ৪৮ মাইল (আরবী) পথ অতিক্রম করার ইচ্ছায় ঘর থেকে বের হয়, তাকে মুসাফির বলা হয়। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ফতোয়ায়ে হিন্দিয়াতে রয়েছে যে, আরবী মাইল হয় চার হাজার হাত বা দুই হাজার গজ, যা আমাদের দেশের ২ কিঃ মিঃ এর সমান। এর ৪৮ মাইল আমাদের দেশের হিসাবে ৯৬ কিঃ মিঃ। কোন অঞ্চলে ১৫ দিন বা তার চেয়ে বেশী থাকার নিয়ত না করলে নামাজ কসর পড়া ওয়াজিব। একথা দ্বারা বুঝা যায়, যদি তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা কোন একটি শহরের কয়েকটি মসজিদ মিলে মোট ১৫ দিন অথবা তার চেয়ে বেশী থাকার নিয়ত করে তবে তাদের নামাজ পরিপূর্ণ পড়তে হবে। (হেদায়া ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃঃ)

অপর পত্রিকাটি উত্তরে লিখেছে ঃ "পনের দিনের উর্ধ্বে এক স্থানে অবস্থান করলে মুসাফির হয় না।"

আর "ইংরেজী মাইল হল ১৭৬০ গজে। শরীয়তের মাইল হল ২০০০ গজে। এভাবে ৪৮ মাইল দূরে যাওয়ার নিয়ত করে আপন এলাকা ত্যাগ করলে এবং সেখানে ১৫ দিনের কমে অবস্থান করার নিয়ত করলে মানুষ মুসাফির হয়। মুসাফির অবস্থায় চার রাকাত ফরজের ২ রাকাত পড়তে হয়। তাবলীগ জামাতের লোকেরা এক স্থানে ১৫ দিন অবস্থান করে না বলে তারা মুসাফির থাকে।"

পাঠকদেরকে এই বিভ্রান্তির কবল থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে তুলে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

উত্তর ঃ মাসআলাটি সম্পর্কে পাঠানো দু'টো উত্তরের কোনটির উপর কোন মন্তব্য না করেই নিম্নে এ মাসআলার জবাব লেখা হচ্ছে ঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের মুজাহিদগণ অমুসলিম দেশে গিয়ে জিহাদ করতে থাকলে যদি সেখানে ১৫ দিনেরও বেশি অবস্থানের নিয়ত করেন, তবুও তারা মুসাফির গণ্য হবেন এবং কসর করতে থাকবেন।

(ফাতাওয়া শামী ২/১২, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৪০)

তাবলীগ জামাতের লোকজন যদি একই গ্রামের বিভিন্ন মসজিদে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়ত করেন, তবে তারা পুরো নামায পড়বেন। পক্ষান্তরে যদি এক জেলা/থানা অথবা ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় ১৫ দিন অবস্থানের নিয়ত করেন, তাহলে পুরো নামায পড়বেন। ((১) বাদায়েউস সানায়ে-১/২৭ (হিন্দ) (২) ফাতাওয়া শামী-১/১২৬ (৩) আল বাহরুর রায়েক-২/১৩২ (৪) তাবয়ীনুল হাকায়েক-১/২১৬)

আরবী মাইল ও ইংরেজী মাইলের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু সফরের দূরত্বের জন্য যে ৪৮ মাইলের কথা বলা হয়, তা ইংরেজী মাইলের হিসাবেই বলা হয়। আরবী হিসবে তা হচ্ছে ৪৫ মাইল। ফিক্হের কিতাবগুলোতে সফরের দূরত্বের ব্যাপারে যে ১৫ ফারসাখ এর কথা বলা হয়েছে, সে হিসাবেও শরয়ী ৪৫ মাইল হয়। কারণ এক ফারসাখ হয় ১৫ মাইলে।

সুতরাং বাংলাদেশ পাক-ভারত তথা উপমহাদেশের সমতলভূমির হিসাবে সফরের দূরত্ব হবে ৪৮ মাইল তথা ৭৭.২৪ কিঃমিঃ। হযরত মুফতী শফী সাহেব তাঁর আওযানে শরীয়া গ্রন্থে এবং মুফতী রশিদ আহমদ সাহেব আহসানুল ফাতাওয়ার ৪নং খণ্ডে সবিস্তার তাহকীকী আলোচনা করেছেন।

উত্তর প্রদান ঃ মুফতী আব্দুল্লাহ

বিশ্ব সংবাদ

চেচেন গেরিলা কমান্ডার শামিল বাসায়েভের প্রশ্ন ঃ চেচনিয়াকে স্বীকৃতি না দিয়ে মুসলিম শাসকগণ আল্লাহ্‌র কাছে কি জবাব দেবেন?

প্রখ্যাত চেচেন কমান্ডার শামিল বাসায়েভ বলেছেন, চেচেন মুজাহিদদের রাজধানী গ্রোজনী ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। এটি কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। আমরা নিজেদের স্বার্থে বুঝে-শুনেই এমনটি করেছি। এক প্রশ্নের জবাবে শামিল বাসায়েভ বলেন, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান চেচনিয়াকে স্বীকৃতি দিয়ে চেচেন জনগণ ও মুজাহিদদের প্রতি অনুপম ভালবাসা এবং বিশ্ব কুফরী শক্তির সামনে বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকগণ তালেবানের এই বিরোচিত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করছে না বলে আমার দুঃখ হয়।

তিনি বলেন, বর্তমানে পাহাড়ে-জঙ্গলে মুজাহিদদের অবস্থান ও কার্যক্রম গ্রোজনী অপেক্ষা অনেক ভাল। এসব জায়গায় রাশিয়ার অস্ত্র ও বোমাবাজি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি মুজাহিদদের আশ্রয়স্থলও প্রচুর। তিনি বলেন, গ্রোজনী ত্যাগ করতে মুজাহিদদের তেমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।

৩৭ বছর বয়স্ক চেচেন কমান্ডার আরো বলেন, চেচেন মুজাহিদদের মাঝে পরস্পর কোন রকম অনৈক্য ও মতবিরোধ নেই। আমরা আফগান জিহাদের চিত্রকে সামনে রেখে সতর্কতার সাথে পা ফেলছি। আমাদের সকল কমান্ডার ও নেতৃবর্গ সব সময় সতর্ক থাকেন, যেন পরস্পর কোন ভুল বুঝাবুঝির সুযোগ না ঘটে।

তিনি বলেন, চেচেনদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য রাশিয়া এই নারকীয় কান্ড দমাচ্ছে না। রাশিয়ার এই নির্মম হত্যাযজ্ঞের কারণ, চেচেনরা মুসলমান। বস্তুতঃ মুসলমান হওয়া বর্তমানে এমনি এক অপরাধ, যার বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ব একজোট। তিনি বলেন, মুসলিম বিশ্বের উচিত, চেচনিয়াকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজেদের ঈমানী ও নৈতিক কর্তব্য পালন করা। এ ব্যাপারে তালেবান মুসলিম শাসকমণ্ডলীর জন্য পথ সুগম করে দিয়েছে। তিনি বলেন, কাফিরদের চেচনিয়াকে স্বীকৃতি না দেয়ার যথেষ্ঠ কারণ আছে বটে; কিন্তু মুসলিম দেশগুলোর এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, তারা চেচনিয়া স্বীকৃতি দিতে পারছে না? পরকালে মুসলিম শাসকগণ আল্লাহ্‌র কাছে এর কী জবাব দেবেন, ভেবে দেখা দরকার। সম্প্রতি ইন্টারনেটে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব চেচেন মুজাহিদদের এই প্রতিনিধি এ কথাগুলো বলেন।

গেরিলা যুদ্ধ কি ভয়ংকর হতে পারে মস্কো শিগগিরই তা দেখতে পাবে

– মুজাহিদ কমান্ডার

মুজাহিদদের ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে একজন মুজাহিদ কমান্ডার বলেছেন, মুজাহিদদের গেরিলা যুদ্ধ কি 'ভয়ংকর' হতে পারে, তা রাশিয়া শিগগিরই দেখতে পাবে। মুজাহিদদের শীর্ষ কমান্ডাররা নিহত হয়েছেন বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা ওয়েবসাইট কাফকাজ সংস্থা অস্বীকার করেছে। এদিকে চেচনিয়ায় গত পাঁচ মাসের যুদ্ধ এখন এক রক্তক্ষয়ী পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অথচ রাশিয়া ঘোষণা করে যে, তারা চেচনিয়ায় বলতে গেলে বিজয় অর্জন করে ফেলেছে। রাশিয়ার এই দাবী যে যথার্থ নয়, তা মস্কোর পরবর্তী স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট। সম্প্রতি মস্কো মাত্র এক সপ্তাহের লড়াইয়ে মুজাহিদদের হাতে তাদের ১৬৫ জন সৈন্য নিহত হবার কথা স্বীকার করেছে।

উলুস-কার্ত ও সেলসেনতাউসে এবং কমসোমোলস্কির কাছে রুশবাহিনী ও মুজাহিদদের মধ্যে তীব্র লড়াই অব্যাহত থাকে। এসব গ্রামের উপর প্রত্যুষে এনটিভি টেলিভিশনের একজন সাংবাদিক কামানের গোলা বর্ষণ করতে দেখেছেন। রাশিয়া স্বীকার করেছে যে, এক সপ্তাহের লড়াইয়ে তাদের ১৬৫ জন সৈন্য নিহত হয়েছে।

ভারত কারগিলে বাংকার নির্মাণ করবে ॥ ব্যয় হবে চার কোটি রুপী

ভারত সরকার চলতি অর্থ বছরেই কারগিলে কয়েকটি বাংকার নির্মাণ করবে। এতে খরচ করবে চার কোটি রুপী। ভারতীয় পত্রিকা এশিয়ান এজ-এর রিপোর্ট মোতাবেক এর জন্য ভারত সরকার অধিকৃত কাশ্মীরের পুতুল সরকারের হাতে ইতিমধ্যে চার কোটি রুপী হস্তান্তর করেছে এবং মুসলমানদের স্বাধীনতার লড়াই দমনের নিমিত্ত কারগিলে ৫১ জন পুলিশ অফিসার মোতায়েন করেছে। ভারতীয় দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর রিপোর্ট মোতাবেক অধিকৃত কাশ্মীরে লড়াই করতে করতে ভারতীয় বাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন তারা কাশ্মীরের রাজনৈতিক সমাধান কামনা করছে। পত্রিকা

বলেছে, অধিকৃত কাশ্মীরে নিয়োজিত সৈন্যরা কঠিন ও লাগাতার ডিউটির ফলে ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছে। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে এখন তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে শুরু করেছে।

তানজানিয়ায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তিলাভ

তানজানিয়া একজন মিসরীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করেছে। ১৯৯৮ সালে তানজানিয়ায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে তাকে অভিযুক্ত হয়। ঐ বোমা বিস্ফোরণে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। বিচার বিভাগের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা একথা জানান।

মোস্তফা মাহমুদ, সাইদ আহমদসহ দু'ব্যক্তিকে বোমা হামলার জন্য দায়ী করা হয়।

ফিলিপাইনে মুজাহিদদের হামলায় ৭ জন সৈন্য নিহত ও ৮ জন জিম্মি

ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপ মিন্দানাওতে মুসলিম মুজাহিদরা সৈন্যদের একটি গ্রুপের উপর হামলা চালিয়ে ৭ জনকে হত্যা ও ৮ জনকে জিম্মি করতে সক্ষম হয়। ফিলিপাইনের সামরিক সূত্রে গতকাল একথা জানানো হয়েছে। ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলে ১৫ হাজার মুজাহিদ ১৯৭৮ সাল থেকে সেখানে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে আসছে।

তসলিমা নাসরিনের বোম্বাই সফরের প্রতিবাদ

বিতর্কিত বাংলাদেশী লেখিকা তসলিমা নাসরিন ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী বোম্বাই পৌঁছেছেন। স্থানীয় মুসলিম সংগঠনগুলোর প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তিনি সেখানে পৌঁছান।

তসলিমা নাসরিনের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শোধ'-এর মারাঠী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশনা উপলক্ষে তিনি সেখানে রয়েছেন।

বোম্বাইয়ের 'রাজা একাডেমী' নামের একটি মুসলিম সমাজ কল্যাণ সংস্থা অন্যান্যের মধ্যে তসলিমা নাসরিনের এই সফরের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তারা বলছে, তসলিমা নাসরিনের লেখনী ও দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম বিরোধী এবং তা মুসলিম অনুভূতিতে আঘাত করে।

রাজা একাডেমীর সভাপতি সাঈদ নূরী বলেন, তসলিমা নাসরিন তার ইসলামবিরোধী ও মুসলিম মূল্যবোধবিরোধী লেখনীর জন্য নিজ দেশেই ধিকৃত ও ঘৃণিত। তিনি নিজ দেশের লোকজনের রোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বদেশ থেকে পালিয়ে গেছেন।

বোম্বাই'র ৬টি মুসলিম সংগঠন প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দিয়েছে। পুলিশ প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রতিহত করার জন্য বোম্বাইয়ে ৫ জনের বেশী সমাবেশকে নিষিদ্ধ করেছে।

জাতীয় মসজিদের জুমার খোতবা

কোন মুসলমানের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভব নয়

- খতীব মাওলানা উবায়দুল হক

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের জুমা'র এক খুতবায় খতীব মাওলানা উবায়দুল হক বলেন, একটি পুরনো প্রবাদ রয়েছে, 'একশ' ইঁদুর মেরে বিড়াল গেছে হজ্বে পাপ মোচন করতে।' এমনি অবস্থা হয়েছে আজকের তুরস্কের। খিলাফতের মূলোৎপাটন করে তারা এখন আয়োজন করছে 'উপসাগরীয় খিলাফতের সাতশ' বছর পূর্তি' উৎসবের।

উসমানীয় খিলাফতের কারণে পুরো বিশ্বে মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা ছিল। তুর্কীদেরও সেরকম সম্মান ছিল মুসলমানদের কাছে। ইহুদী নাসারাদের প্রভাবিত কিছু ব্যক্তি সুকৌশলে তুর্কী খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অবস্থান নেয়। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীতে তাদের তৎপরতা ছিল লক্ষণীয়। এদেরই একজন মোস্তফা কামাল পাশা। পরে তাকে আতাতুর্ক বলা হতো। সে ছিল বিশিষ্ট যোদ্ধা। যুদ্ধের কলাকৌশলে তার নৈপুণ্য ছিল। ইহুদী-খৃষ্টানরা মন-মগজ প্রভাবিত করে তাকে নাস্তিক বানিয়ে ফেলে। ইসলাম-খিলাফত এগুলো সে সহ্য করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ১৯২৪ সালে সে খিলাফতের অবলুপ্তি ঘটায়।

তিনি বলেন, আমাদের উপমহাদেশে খিলাফত টিকিয়ে রাখার জন্য ১৯২০-১৯২৪ সাল পর্যন্ত খিলাফত আন্দোলন করা হয়। কিন্তু বাইরের শত্রুদের বদলে ঘরের ভেতরের আক্রমণেই খিলাফত উৎখাত হয়।

সুলতান আবদুল হামিদকে সরিয়ে ক্ষমতায় বসে কামাল পাশা। ক্ষমতায় বসেই সে ইসলাম, আল্লাহ্, কুরআন অস্বীকার করে তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। আরবী ভাষা নিষিদ্ধ করা হয়। নামায আদায়, কুরআন তিলাওয়াত তুর্কী ভাষায় করতে নির্দেশ দেয় হয়। তুর্কী ভাষা আরবী হরফে লেখা হতো। কামাল পাশা আরবী হরফের বদলে ল্যাটিন হরফে তুর্কী ভাষা চর্চার নির্দেশ দেয়। ফলে পরবর্তী প্রজন্ম আর আরবী পড়তে শেখেনি। তারা কুরআন পড়তে পারে না।

খতীব বলেন, অনেকে কামাল আতাতুর্ককে আদর্শ হিসেবে মনে করেন। কামাল পাশা তাদেরই আদর্শ হতে পারে, যারা তার মত নাস্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ। আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। দুঃখজনক হলো, ঢাকার একটি প্রধান সড়কের নাম কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ।

তিনি বলেন, খেলাফত আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব। পবিত্র কুরআনে মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে ফেরেশতাদের বলেছেন, আমি দুনিয়াতে আমার প্রতিনিধি পাঠাবো। ফেরেশতারা বললেন, ইবাদতের জন্য তো আমরাই যথেষ্ট। উত্তরে আল্লাহ্ বলেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না। এরপর আল্লাহ্ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। আদম (আঃ) দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রথম খলিফা।

মাওলানা উবায়দুল হক আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জানিয়েছেন, আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। যারা আমার আদর্শ অনুসরণ করবে, তারাই সঠিক পথে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পর খোলাফয়ে রাশেদা, উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফত, মিসরীয় খিলাফত হয়ে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯২৪ সালে কামাল পাশা ঘোষণা করলেন, ধর্মের ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র পরিচালিত হতে পারে না। পাশ্চাত্য প্রভাবিত কামাল পাশার চিন্তা এখনকার তুর্কী শাসকরাও অনুসরণ করছে। এখনো তুরস্কে আরবী পড়া নিষিদ্ধ। মেয়েদের হিজাব পরা নিষিদ্ধ। এই শাসকদের ওসমানীয় খেলাফতের ৭শ' বছর পূর্তি উৎসব আয়োজন তাদের জন্যই লজ্জাকর।

মাওলানা উবায়দুল হক বলেন, খিলাফতের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠা করা। কোন মুসলমানের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুসরণ করা অসম্ভব। খেলাফতের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতা ত্যাগ করতে হবে।

জুলফিকার

ডঃ মিসকীন আলী হেজাজী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরিকল্পনার প্রথম অংশ মোতাবেক উখলগুর অবরোধ শক্ত করা হয়। তমিরখানশুরা ও তিবলিস থেকে আরো সেনা তলব করা হয়। তমিরখানশুরা থেকে দশ হাজার নতুন সৈন্য এসে পৌঁছলে উখলগুর অবরুদ্ধ মুসলিম সেনাদের উপর চাপ বৃদ্ধির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। বড় তোপগুলো উঁচু জায়গায় পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। ছোটগুলোকে আরো সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। উখলগুর চারদিকের প্রহরাও কঠোর করা হয়।

১৩ জুলাই ভোরে তোপগুলো আগুন আর লোহা নির্গত করতে শুরু করে। বিরামহীন তীব্র গোলাবর্ষণে অধীন রুশ অফিসাররা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়ে। এক অফিসার সেনাপতি গ্রেব-এর কাছে সবিনয়ে জানতে চায় যে, জনাব! পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা নেই কি? সেনাপতি গ্রেব ধমকের সুরে জবাব দেয়, পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি অবগত। প্রতিটি অভিযানই আমাদের পরিকল্পনার একটি অংশ। তুমি তোমার নিজের কাজ কর গিয়ে।

২ আগস্ট ভোরে পদাতিক বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আদেশ পায়। রুশ পদাতিক বাহিনীর সেনারা মুজাহিদদের আক্রমণ এড়িয়ে সম্মুখ সমরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পদে পদে তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রায় একশত মুজাহিদ গুলি বৃষ্টির মধ্য দিয়ে পদাতিক রুশ সেনাদের দিকে ধেয়ে আসে। নিকটে পৌছঁতে পৌঁছতে বাইশজন মুজাহিদ শহীদ কিংবা গুরুতর আহত হয়। অবশিষ্টরা রুশ সেনাদের ভিতরে ঢুকে রাইফেলের পরিবর্তে তাদের প্রিয় হাতিয়ার খঞ্জর চালাতে শুরু করে। মুজাহিদদের এই সীমাহীন দুঃসাহসিক অভিযান রুশ সেনাদের বিব্রত ও বিপর্যস্ত করে তোলে। দিশেহারার মত তারা নিজেদের লোকদের উপর গুলি ছুড়তে শুরু করে। এক ঘণ্টা যাবত তীব্র লড়াই চলে। লড়াই করতে করতে সকল মুজাহিদ শহীদ হয়ে যায়। জীবন দিয়ে তারা রুশ সেনাদের মনে আরেকবারের মত আতংক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। আক্রমণকারী পদাতিক রুশ সেনাদের সংখ্যা ছিল আড়াই হাজার। তার সামান্য ক'জন-ই জীবন নিয়ে ফিরে যেতে সক্ষম হয়।

সেনাপতি গ্রেব দ্রুত দ্বিতীয় বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয়। অতঃপর তৃতীয় বাহিনী – তারপর চতুর্থ। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। মুজাহিদরা একে একে প্রায় সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। সেনাপতি গ্রেব-এর সৈন্যরা প্রায় সব শেষ হয়ে যায়। সাধারণতঃ এত বিপুল সৈন্যকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া যায় না। কিন্তু গ্রেব-এর সামনে এক বিরাট উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনে গ্রেব তার সমুদয় সৈন্যকে লাশে পরিণত করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

রুশ বাহিনী আরো দু'দিন উখলগুর উপর সামরিক চাপ বহাল রাখে। ৪ আগস্টের সন্ধ্যাবেলা তারা পুনরায় জোরদার এক অভিযান চালায়। এ অভিযানে তারা তাদের সহকর্মীদের লাশ দিয়ে মোর্চার কাজ নেয়। সামনের সৈন্য আহত বা নিহত হলে পিছন সারির সৈন্যরা তার লাশের আড়ালে বসে ফায়ার শুরু করে দেয়। এ লড়াইয়েও অনেক মুজাহিদ শহীদ হন। তবে রুশদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল কয়েকগুণ বেশি।

রাতে যথারীতি যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। ইমাম শামিল মসজিদে গিয়ে নায়েবদের উদ্দেশে ভাষণ দেন।

তিনি বলেন ঃ

'আমরা স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্য লড়াই করছি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা-ই আমাদের ইচ্ছা। পরিস্থিতি বড় কঠিন। মনে হচ্ছে, জার তার সব সামরিক শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই। ভয় তো করবে তারা, যারা জীবনকে মায়া করে। আমাদের কাছে তো শাহাদাত জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয়। তথাপি এই কঠিন মুহূর্তে আপনাদের কারো নতুন কোন প্রস্তাব থাকলে তা ব্যক্ত করুন।'

নায়েব ইউনুস ঃ আমাদের জীবন আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গিত। আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে আমার ধারণা, একই স্থানে চূড়ান্ত লড়াই করা কৌশলগত দিক থেকে আমাদের ঠিক হয়নি।

সুরখাই খান ঃ এসব চিন্তা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে করা উচিত ছিল। চূড়ান্ত লড়াই করার সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর এখন এসব চিন্তা বৃথা।

ইউনুস ঃ নতুন নতুন সৈন্য এসে রুশ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। আমরা এখন সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। অস্ত্র এবং রসদ শেষ হওয়ার পথে। আমাদের শাহাদাত আর আত্মহত্যার পার্থক্য বুঝা উচিত।

ইত্যবসরে ইমাম শামিলের খাদেম এসে বলে, হযরত! এরাগল থেকে একজন লোক এসেছেন। আপনাকে তিনি একটি জরুরী পয়গাম জানাতে চান।

ইমাম শামিল ঃ কে এসেছে, নিয়ে এস তাকে।

কয়েক মুহূর্ত পর এক আগন্তুক নিকটে এসে ইমামকে সালাম করে। লোকটির পরনের কাপড় ভিজা।

ইমাম শামিল লোকটিকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করেন, রুশ প্রহরীরা তোমাকে আসতে দিল কিভাবে?

আগন্তুক ঃ আমি নদীপথে সাঁতার কেটে এসেছি। মুরশিদের দোয়ায়-ই বোধ হয় রুশরা আমাকে দেখতে পায়নি। আমার নাম তালহীক।

ইমাম শামিল ঃ বল কি উদ্দেশ্যে এসেছ?

তালহীক মাথার পাগড়ী খুলে হাতে নেয়। পাগড়ীর ঝুলের গিড়া খুলে তাসবীহ ও আংটি বের করে। মুখ লাগিয়ে চুম্বন করে বস্তু দু'টো ইমামের প্রতি এগিয়ে ধরে বলে, পীর ও মুরশিদ তাঁর এই চিহ্নগুলো আমাকে দিয়েছেন, যাতে আমি যে তার শিষ্য, আপনার বিশ্বাস হয়।

ইমাম শামিল বস্তু দু'টোকে গভীরভাবে নীরিক্ষা করে দেখেন। অতঃপর আগন্তুককে বলেন, বলুন, কী পয়গাম নিয়ে এসেছেন?

তালহীক ঃ মহামান্য ইমাম! পীর ও মুরশিদ বলেছেন, এই বিপদসংকুল মুহূর্তে আমাদের ভালো-মন্দের ভার আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেয়া উচিত এবং আমাদের সব কিছু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বিসর্জন দেয়া দরকার। শায়খ বলেছেন, শিকারীর হাতে অবরুদ্ধ হওয়ার পর কৌশলে বেরিয়ে আসলে সিংহ বিড়াল হয়ে যায় না– সিংহ-ই থাকে এবং বনের রাজত্ব ফিরে পায়। অপরদিকে শক্ত পায়ে শিকারীর রাইফেলের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে তার পরিণতি স্পষ্ট। অনেক সময় তো এমনও হয় যে, বিপদের সময় সিংহ তার বাচ্চাদের সাময়িকের জন্য চোখের আড়ালে নিয়ে রাখে, যাতে নিজে সহজে বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। পীর ও মুরশিদ আরো বলেছেন, কয়েক বছর আগে ভারত উপমহাদেশে এক সিংহ ঠিক এমনিভাবে শিকারীর ফাঁদে আটকা পড়েছিলেন, যেমনি আজ দাগিস্তানের ইমাম দুশমনের হাতে অবরুদ্ধ। সেই সিংহের নাম টিপু। সেই অবরোধ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তিনি নিজের দু' সন্তানকে জালিম শিকারীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে মুক্ত হয়ে তিনি জালিমদের সেই জুলুমের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন কড়ায়-গণ্ডায়।

ইমাম শামিল ঃ হ্যাঁ, মক্কা শরীফে কার কাছে যেন আমিও শুনেছিলাম যে, সুলতান টিপু সত্যিই সিংহের মত লড়াই করেছিলেন।

তালহীক ঃ পীর ও মুরশিদের আদেশ, আপনাকে পয়গাম পৌঁছিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে খবর জানাতে হবে। অন্যথায় এখনই আমি আপনার মুরীদ

হয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। তবে মুরশিদকে খবরটা পৌছিয়ে আমি শিগ্‌গির ফিরে আসছি। অনুমতি হলে এবার উঠি।

সুরখাই খান ঃ মহামান্য ইমাম! ইনি যাবেন কি করে? চারদিকে পাহারা। আসার সময় নদীর স্রোত তার অনুকূল ছিল। কিন্তু উজান ঠেলে যাওয়া যে কঠিন হবে!

তালহীক ঃ আমি শায়খে এরাগলের শিষ্য। তারই নিকট থেকে রহস্যময় উপায় কাজ করার তরিকা আমার রপ্ত করা আছে। দীর্ঘ সময় পানিতে ডুব দিয়ে থাকার এবং ডুবন্ত অবস্থায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার প্রশিক্ষণ আমার নেয়া আছে। তারপরও যদি দুশমন আমাকে দেখেই ফেলে, তাহলে আমার শাহাদাত নসীব হয়ে যাবে।

আগন্তুক বিদায় হয়ে যায়। ইমাম শামিল বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্য নির্জনে চলে যান।

৫ আগস্ট রুশ বাহিনী আক্রমণের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি করে। মুজাহিদরাও বীরত্বের সাথে আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই শুরু হয়।

রাতের বেলা।

সীমান্ত এক এলাকার সরদার আবদাল রুশ সেনাপতি গ্রেব-এর তাঁবুতে প্রবেশ করে। চলমান লড়াইয়ে আবদালের অবস্থান নিরপেক্ষ। গ্রেবের সঙ্গে তার আলোচনা হয়। অতঃপর দু' হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে যায় সে।

৬ আগস্ট ভোরবেলা আবদাল সাদা পতাকা হাতে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। রুশ সৈন্যরা তার গতিরোধ করে এবং ধরে কমান্ডারের কাছে নিয়ে যায়। খানিক পর সে পতাকা উঁচু করে ইমাম শামিলের মোর্চা অভিমুখে রওনা হয়। এ খবর ইমাম শামিলের কানে দেয়া হয়। ইমাম বলেন, ওকে ভিতরে আসতে দিও না। কি বলতে এসেছে, বাইরের চত্বরে দাঁড়িয়ে-ই বলতে বল। হতে পারে ও আমাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে এসেছে।

আবদালের সঙ্গে কথা বলার জন্য ইমাম শামিল সুরখাই খানকে প্রেরণ করেন। আবদাল সুরখাই খানকে বলে, রক্তক্ষয় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌছেছে। বিগত কয়েক শতাব্দীতে কাফকাজে এত রক্ত ঝরেনি, যা এই এক মাসে ঝরেছে। আমি উভয় পক্ষের নিকট আপোসের প্রস্তাব নিয়ে ময়দানে এসেছি। আমি চাই, কোন পক্ষের আর এক ফোঁটা রক্তও না ঝরুক। ইমাম শামিলকে বলুন, তিনি যেন আলোচনার মাধ্যমে রুশদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করে নেন। খুনাখুনি অনেক হয়েছে ; আর নয়।

সুরখাই খান ঃ আলোচনার ব্যাপারে রুশদের কোন শর্ত আছে কি?

আবদাল ঃ আছে অবশ্যই। বিজয় এখন তাদের হাতের মুঠোয়। আজ না হোক কাল অবশ্যই ইমামের অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ না করলে ধ্বংস সুনিশ্চিত। আলোচনা শুরু করার আগে রুশরা জামানত চায়, যাতে তারা উর্ধ্বতন অফিসারদের আশ্বস্ত করতে পারে।

সুরখাই খান ইমাম শামিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে যান। আবদাল সেখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করতে থাকে। খানিক পরে এসে সুরখাই খান আবদালকে বলেন, আপনি এখন যান, আবার এক সময় এসে জবাব নিয়ে যাবেন।

আবদাল চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ান তোপগুলো গোলাবর্ষণ করতে শুরু করে। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ।

৬ আগস্ট রাতে তমীরখানশুরা থেকে পাঁচ হাজার রুশসেনা উখলগুর নিকটে এসে পৌঁছে। সেনাপতি গ্রেব-এর আদেশে তাদেরকে রণাঙ্গন থেকে কিছুটা দূরে থামিয়ে দেয়া হয়। উখলগুতে অবস্থানরত সেনাদের থেকেও দু' তিন হাজার সৈন্যকে রাতের আঁধারে তমীরখানশুরা থেকে আগত বাহিনীর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেনাপতি গ্রেব-এর আদেশ, আগামীকাল সূর্যোদয়ের পর থেকে যেন তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পতাকা উড়িয়ে উখলগু অভিমুখে অগ্রসর হতে শুরু করে।

৭ আগস্ট ভোর হওয়া মাত্র আবার যুদ্ধ শুরু হয়। ইমাম শামিল মসজিদে দাঁড়িয়ে দূরবীনের সাহায্যে চারদিকের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। জর্জিয়ার সৈন্যরা এ দূরবীনটি ইমামকে উপহার দিয়েছিল।

হাজার হাজার রুশ সৈন্য উখলগু অভিমুখে এগিয়ে চলছে। নায়েব সুরখাই খান ও ইউনুস ইমামের কাছে উপস্থিত। শিশু জামালুদ্দীনও কাছে দাঁড়িয়ে। এ সময়ে ইমাম বলেন ঃ

"অনেক সৈন্য ধেয়ে আসছে। অস্ত্র থাকলে আমি আজ উখলগুকে রুশদের সমাধিতে পরিণত করে ছাড়তাম। কিন্তু অস্ত্র তো নেই। আমরা এখন কি করতে পারি!"

ঠিক এ সময়ে একটি গোলা এসে ইমামের অদূরে বিস্ফোরিত হয়। ইমাম অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যান। সুরখাই খান ও ইউনুস ইমামকে মোর্চায় নিয়ে যান।

সেদিন সন্ধ্যায় আবদাল আবার আসে। তার প্রস্তাবের জবাব চায় সে। সুরখাই খান ইমামের প্রতিনিধি হয়ে জবাব দেন ঃ

"নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতির পরই কোন আলোচনা শুরু হতে পারে।"

এ জবাব শুনে আবদাল ফিরে যায়। পুনরায় তুমুল লড়াই শুরু হয়। সেনাপতি গ্রেব রাগে-ক্ষোভে পাগলের মত হয়ে যায় এবং অধীন অফিসারদের নিয়ে তর্জন-গর্জন করতে শুরু করে। বলে, এত হাজার হাজার সৈন্য হারাবার পরও যদি আমাদের লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তাহলে আমাদের বড় অপ্রীতিকর পরিণতি ভোগ করতে হবে। কিছু একটা করতেই হবে আমাদের। ইমাম শামিলকে হত্যা কিংবা গ্রেফতার করার কোন একটা পন্থা আমাদের বের করতেই হবে।

এক মেজর পাঁচ ফুট চওড়া একটি কাঠের তক্তা নিয়ে সেনাপতির সামনে উপস্থিত হয়। তক্তার বহির্ভাগে লোহার পাত বসানো। মেজর তক্তাটি সেনাপতি গ্রেব-এর সামনে রেখে বলেন, দু'জন সৈন্য যদি এ তক্তাটি নিয়ে সামনে অগ্রসর হয় আর অন্যরা তার আড়ালে থেকে চলে, তাহলে মুজাহিদদের খঞ্জর ও গোলার আক্রমণ থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। আপনার অনুমতি পেলে আমি বিষয়টি পরীক্ষাও করে দেখতে পারি। আমি এরকম একশত তক্তা তৈরি করেছি।

সেনাপতি গ্রেব ঃ কোন অসুবিধা নেই। তবে আমাদের সৈন্যরা এমন পথে অগ্রসর হবে, যে পথে উপর থেকে বড় পাথর বা অন্য কোন ভারি বস্তু নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশংকা নেই।

মেজর এক হাজার সৈন্যকে পঞ্চাশজন করে বিশটি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলকে এক একটি তক্তার আড়ালে হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আদেশ করে। প্রত্যেক দলে দু'জন করে সৈন্য হাঁটুতে ভর করে তক্তাকে সামনে ধরে ধীরে ধীরে এগুতে শুরু করে। অন্য সিপাহীরা পিছনে।

রুশ মেজরের এই রণকৌশল আংশিক সফল হয়। কোন কোন স্থানে উপর থেকে নিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথর তক্তা ভেঙ্গে চুরমার করে রুশ সেনাদের পিষে নীচে পতিত হলেও কয়েকটি দল এই আক্রমণ প্রতিহত করে সম্মুখসমরে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সাফল্য দেখে সেনাপতি গ্রেব আরো এক হাজার সৈন্যকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয়। তক্তার আড়ালে নিরাপদে যারা মুজাহিদদের মোর্চার নিকটে পৌঁছুতে সক্ষম হয়, তাদের সঙ্গে মুজাহিদদের হাতাহাতি লড়াই হয়। হাতাহাতি লড়াইয়ে মুজাহিদরা বেশ বীরত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু রুশদের বিবেচনায় তাদের দশজন সৈনিকের মৃত্যু একজন মুজাহিদের শাহাদাতের সমান। নিজেদের দশজন সৈন্য খুইয়ে একজন মুজাহিদকে শহীদ করতে পারাকে তারা সাফল্য জ্ঞান করে। পরবর্তী কয়েকদিন পর্যন্ত রুশরা

এ নিয়মে লড়াই অব্যাহত রাখে।

পরদিন প্রত্যুষ যখন পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হয়, তখন মুজাহিদদের পানির পাত্র শূণ্য হয়েছে দু'দিন পূর্ণ হলো। রসদ-পাতির মজুদও সম্পূর্ণ শেষ। বাচ্চাদের অবস্থা বড় করুণ। ক্ষুৎ-পিপাসায় চিৎকার করছে তারা। দু'দিনের অনাহারে মুজাহিদরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। রুশ সেনাপতি অবরুদ্ধ মুজাহিদদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষ হওয়ার খবর পায়। রুশ প্রহরীদের অধিকতর সতর্ক হওয়ার জন্য তাকিদ করা হয়।

আবদালকে পুনরায় ইমাম শামিলের নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেনাপতি গ্রেব-এর অধীন এক অফিসার বলে, এখন এর প্রয়োজন কী? আর সামান্য চাপ সৃষ্টি করতে পারলেই তো চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি। গ্রেব তাকে বুঝাবার চেষ্টা করে যে, এত আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত হবে না। শামিল অতি ধূর্ত মানুষ। কোন্ ফাঁকে পালিয়ে যাবে তুমি টেরও পাবে না। তাই আমাদের কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। তার পুত্রকে যদি আমরা কাবু করতে পারি, তাহলে বেটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। আমিও এটাই চাই যে, সে পালাবার চেষ্টা না করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাক।

নিরপেক্ষ সরদার আবদাল পুনরায় সুরখাই খানের সঙ্গে আলাপ করে। সুরখাই খান ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। কিন্তু বলিষ্ঠ ও উচ্চকণ্ঠে কথা বলে তিনি নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখতে সক্ষম হন। আবদাল বলে, রুশরা এ মর্মে সম্মত হয়েছে যে, ইমাম তার পুত্রকে আমার হাতে জামানত রাখলে আপনাদের সঙ্গে তারা আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। আমি নিরপেক্ষ মানুষ, আলোচনার মাধ্যমে একটি মীমাংসা হয়ে গেলে জামালুদ্দীনকে আমি তার পিতার হাতে ফিরিয়ে দেব। চলমান রক্তক্ষয়ে আমার হৃদয় কাঁদছে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে আমি এর চেয়ে উত্তম আর পথ দেখছি না।

সুরখাই খান বলেন, আগামীকাল সকালে আপনাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

আবদাল চলে যায়।

১৭ আগস্ট রাতে শিশু-সন্তানদের জীবন হাতে নিয়ে মুজাহিদরা পানি সংগ্রহের জন্য নীচে অবতরণ করে। রুশদের গোলাবৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এ অভিযানে সাতজন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন।

কয়েকজন দুর্ধর্ষ মুজাহিদ খাদ্য সংগ্রহের অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। রুশ বাহিনীর ক্যাম্প থেকে খাদ্য ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয় তারা। তাদেরও কয়েকজনের শাহাদাত নসীব হয়।

জামানত

১৭ আগস্ট পূর্বাকাশে যখন সূর্য উদয় হয়, তখন যুদ্ধের বয়স ৫১ দিন। ইমাম শামিল পুত্র জামালুদ্দীনকে জামানতস্বরূপ নিরপেক্ষ সরদার আবদাল এর হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জামালুদ্দীনের মা পুত্রকে উত্তম পোষাক পরিয়ে সাজিয়ে দেন। পিতা অস্ত্রসজ্জিত করেন পুত্রকে। কোমরে তরবারী ও খঞ্জর বেঁধে দেন জামালুদ্দীনের। নায়েব সুরখাই খান, ইউনুস ও আমীর কালো পতাকা উড়িয়ে ইমাম পুত্রের সম্মুখে সম্মুখে এগিয়ে চলেন।

খানিক দূরে আবদাল দু'টি ঘোড়া নিয়ে দণ্ডায়মান। একটি কালো, অপরটি সাদা। জামালুদ্দীন সাদা ঘোড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। পলকের জন্য পিছন দিকে তাকায়। বিধ্বস্ত মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উপর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন ইমাম। পলকহীন চোখ দু'টো কলিজার টুকরা জামালুদ্দীনের প্রতি নিবদ্ধ তার।

জামালুদ্দীন লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসে। পতাকা অবনমিত করে জামালুদ্দীনকে সালাম জানায় নায়েব।

আবদাল অপর ঘোড়ায় চেপে বসে। দু'টি ঘোড়া পাশাপাশি এগুতে শুরু করে। ঘন বৃক্ষরাজির আড়ালে মিলিয়ে যায় ঘোড়া দু'টো।

১৯ আগস্ট প্রত্যুষে রুশ সেনাপতি পিলুপাঞ্চ বেশ ক'জন অফিসার নিয়ে উখলগু এসে পৌঁছে। ইমাম শামিলের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য সেনাপতি গ্রেব-এর পক্ষ থেকে এসেছে সে। ইমাম শামিল বিশিষ্ট নায়েবদের নিয়ে গুহার মত একটি পাতাল গৃহে রুশ প্রতিনিধিদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

সেনাপতি পিলু গুহায় প্রবেশ করে ইমামের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ইমাম নির্বিকার। রুশ সেনাপতির সঙ্গে হাত মিলালেন না তিনি। চেহারায় তার আত্মমর্যাদার ছাপ।

'আমরা অহংকারীদের সাথে হাত মিলাই না।' বললেন সুরখাই খান। লজ্জায়-ক্ষোভে লাল হয়ে যায় সেনাপতি। সুরখাই খানের প্রতি আড়চোখে দৃষ্টিপাত করে সে। অবশেষে নিজেকে সংবরণ করে ইটের উপর বিছানো একটি কাঠের তক্তায় বসে পড়ে।

আলোচনা শুরু হল।

'যুদ্ধে আপনি পরাজিত। এবার নিয়মতান্ত্রিকভাবে অস্ত্রসমর্পণ করুন। শাহেনশাহ আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন।' সেনাপতি বলল।

এক রণাঙ্গনের ফলাফল গোটা যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল নয়। নিয়মতান্ত্রিকভাবে অস্ত্রসমর্পণ করতে শিখিনি আমরা। তবে আমাদের দু'টি শর্ত মেনে নিলে ভবিষ্যতে আমরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পারি।' বললেন ইমাম শামিল।

সেনাপতি পিলু ঃ বলুন, শর্ত দু'টো কী আপনার?

ইমাম শামিল ঃ প্রথম শর্ত, যুদ্ধ বন্ধ করে আমরা গমরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাই। পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে আমাদের। দ্বিতীয় শর্ত, আমার পুত্র জামালুদ্দীন আবদালের কাছেই থাকবে। আমাদেরকে মাসে অন্ততঃ একবার তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত এই চুক্তি বহাল থাকবে, ততদিন আমরা কোন পদক্ষেপ নেব না।

'জামালুদ্দীন তো এখন তমিরখানশুরা অতিক্রম করে তিবলীস অভিমুখে এগিয়ে চলছে। শাহেনশাহ নিজেই তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।' নিষ্ঠুর অট্টহাসি হেসে বলল সেনাপতি।

ঝেঁকে উঠে ইমামের সমস্ত দেহ। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়ে উঠে তাঁর। প্রচণ্ড এক ধাক্কা লাগে তাঁর হৃদয়ে। রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে-শোকে লাল হয়ে যায় তার চেহারা। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন রুশ সেনাপতির মুখের দিকে। অতঃপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, 'আবারো তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। আমি এর প্রতিশোধ নেব। বড় ভয়ংকর হবে সেই প্রতিশোধ।'

সেনাপতি পিলুর মুখে কটাক্ষ হাসি। বলে, নিজের জীবনের প্রতি রহম করুন জনাব! অস্ত্রত্যাগ না করলে নিজের সাধের জীবনটাও খোয়াতে হবে আপনার।

'যে লজ্জাকর প্রতারণার প্রদর্শন তোমরা করেছ, এখান থেকে জীবিত ফেরত যেতে না দেয়াই ছিল তার উপযুক্ত জবাব। কিন্তু আমরা মুসলমান। তোমাদের মত ইতরামী করতে পারি না আমরা। তোমরা বলছ, তোমাদের সাম্রাজ্য অনেক বিশাল, তোমাদের জার বিরাট এক রাজা। এটাই কি সেই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মহান রাজার মহান সেনাপতিদের চরিত্র? চলে যাও এখান থেকে।' ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন ইমাম।

রুশ অফিসাররা ফিরে যায়। তাদের ক্যাম্পে পৌঁছানোর সাথে সাথে রুশী তোপ-কামাল গোলাবর্ষণ শুরু করে। বাংকারে পৌঁছে ইমাম তাঁর নায়েবদের নিয়ে পরামর্শে বসেন। রাশিয়ানদের এই বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই অবরোধ থেকে বের হতে হবে। সিদ্ধান্ত হয়, ইমাম শামিল কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদ, মা-বোন-স্ত্রী ও শিশুপুত্র সাঈদকে নিয়ে অবরোধ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। অবশিষ্ট মুরীদগণ রুশদের মোকাবেলা করবেন। অপরদিকে রুশরাও ইমামের

পালাবার সকল পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

২০ আগস্টের ঘুটঘুটে আঁধার রাত। মুলষধারে বৃষ্টি পড়ছে। ইমাম শামিল ফাতেমা, গাজী মুহাম্মদ, সাহেদা, মা, বোন, দুধের শিশু সাঈদ এবং দশজন জানবাজ মুরীদকে সঙ্গে নিয়ে রশির সাহায্যে উখলগুর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে নেমে পড়েন। ফাতেমা তখন অন্তঃসত্ত্বা। তৃতীয় সন্তানের মা হতে তার মাত্র এক মাস বাকী। রশি বেয়ে নীচে অবতরণ করতে সীমাহীন কষ্ট স্বীকার করতে হয় তাকে। চারদিকে রুশদের তাক করা রাইফেল আর তোপ।

দক্ষিণ দিকে আধা ফার্লং দূরে নদীর ভিতরে এক চড়া। একটি গুহা তৈরি হয়ে আছে তাতে। ইমাম শামিলের পরিকল্পনা, প্রথমে সেই চড়ায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। তারপর সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা।

একজন একজন করে প্রত্যেকে উখলগুর উপর থেকে নীচে নেমে আসেন। শেষে রশির-ই সাহায্যে উপর থেকে নামিয়ে আনা হয় কয়েকটি কাঠের তক্তা। নায়েব রশি দিয়ে বাঁধেন তক্তাগুলো। অতঃপর ঘাস আর কাপড় দ্বারা তৈরি পাঁচজন মানুষ নামিয়ে আনা হয় নীচে। মুজাহিদের পোষাকে ঘাস ভরে তৈরি করা হয়েছিল মানুষগুলো। এই কৃত্রিম মানুষগুলোকে দাঁড় করিয়ে কষে বাঁধা হয় তক্তার সাথে।

ইত্যবসরে আকাশে বিজলী চমকায়। বিজলীর আলোতে রুশ সৈন্যরা দেখতে পায় কয়েকজন মুজাহিদ নৌকায় বসে আছে। গুলি ছুড়তে শুরু করে তারা। ইমাম ও নায়েব নেমে পড়েন পানিতে। একটি গুলি এসে ইমামের বোনের গায়ে বিদ্ধ হয়। সংবরণের চেষ্টা করে সে। কিন্তু তার অজান্তে মুখ থেকে তার বেরিয়ে আসে চাপা আর্তচীৎকার। ইমাম সঙ্গে সঙ্গে মোড় ঘুরিয়ে টেনে পানিতে নিয়ে আসেন বোনকে। হাত চেপে ধরে তার মুখে, যাতে আর চীৎকার করতে না পারে এবং দুশমন তাদের উপস্থিতি টের না পায়। কিন্তু মুহূর্ত পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। শহীদ হন ইমামের বোন।

কাঠের তক্তাগুলো পানিতে ভাসিয়ে দিতে আদেশ করেন ইমাম। কিছুক্ষণ পর আবার বিজলী চমকায়। ততক্ষণে তক্তাগুলো ভেসে চলে গেছে অনেক দূর। তক্তার উপর দাঁড় করিয়ে বাঁধা কৃত্রিম মানুষগুলোকে মুজাহিদ মনে করে রুশ সৈন্যরা রাইফেলের মুখ ঘুরিয়ে দেয় সেদিকে। এ সুযোগে সঙ্গীদের নিয়ে সামনের চড়ার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন ইমাম।

তীব্র স্রোতে বয়ে চলেছে নদী। স্রোতের বিপরীতে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব। এক নায়েব গাজী মুহাম্মদকে বুকে জড়িয়ে রাখেন। অপরজন সাইদকে। যাহেদা বেগম সাঁতার কাটছে। এক নায়েব ভর দিয়ে রেখেছেন ফাতেমাকে। তাকে সামলে রেখেছেন ইমাম নিজে।

কতগুলো মানুষের ঈমানদীপ্ত দৃঢ়তা আর আবর্তসংকুল নদীর তীব্র উর্মিমালার মাঝেও চলছে যুদ্ধ। ঈমান ও কুফরের অসম লড়াই।

আবার বিজলী চমকায়। পানির মধ্যে ডুব মেরে আত্মগোপন করে তারা। এবার বিজলী নেই। চতুর্দিক সূচীভেদ্য অন্ধকার। নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। হঠাৎ তীব্র এক ঢেউ কি একটি ভারী বস্তু ছুড়ে মারে ইমাম শামিলের প্রতি। ইমামের মাথায় প্রচণ্ড এক আঘাত হানে। ব্যাথায় কুঁকিয়ে উঠেন ইমাম। পর মুহূর্তে স্রোতের ঘুর্ণাবর্তে পাঁক খেয়ে আবার সেটি ছিটকে এসে তীব্রগতিতে হাতুড়ীর মত নিক্ষিপ্ত হয় ইমামের মায়ের কপালে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন মা। বস্তুটি ছিল শক্ত একটি কাঠ।

মাকে কাঁধে তুলে নেন ইমাম। বহু কষ্টে মাকে নিয়ে সম্মুখের চড়ায় গিয়ে পৌঁছেন তিনি। কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখেন মাকে। ততক্ষণে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে ফেলেছেন ইমামের মা।

ফাতেমার অবস্থাও শোচনীয়। ইমাম অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন, 'আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি-ই আমার সন্তুষ্টি। আমায় তুমি ধৈর্য ধারণের তাওফীক দাও।'

শোকাহত ইমাম মায়ের মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেন। ২২ আগস্ট সারাদিন তারা গুহায় লুকিয়ে থাকেন। রাতে নায়েবগণ পরবর্তী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এখন তারা যে চড়ার গুহায় লুকিয়ে আছেন, তার থেকে এক শত ফুট দূরে আরো কয়েকটি চড়া। সেগুলোর পরে নদীর স্রোত তত তীব্র নয়। কিন্তু এই একশত ফুট জায়গায় স্রোতের তীব্রতা এতই বেশী যে, এ পথটুকু অতিক্রম করা অসম্ভব।

ভেবে-চিন্তে নায়েবগণ সিদ্ধান্ত নেন, যে কোনভাবে হোক, এক দু'জন লোক একটি রশি নিয়ে স্রোত টেনে পরবর্তী চড়ায় পৌঁছুতে হবে এবং রশির এক মাথা সেখানে বড় একটি পাথরের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর রশি বেয়ে দুই প্রান্তরের মাঝের পথটুকু অতিক্রম করতে হবে সকলকে।

কিন্তু রশি বাঁধার জন্য অপর চড়ায় যাওয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার-ই শামিল। তবে নায়েবগণ সকলেই এ ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইমাম শামিম বললেন, 'এ কাজ আমি করব'।

ইমাম শামিল রশির এক মাথা কোমরে বেঁধে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পানিতে নেমে পড়েন। তাঁর প্রত্যয় পানির স্রোতের উপর জয়ী হয়। অপর চড়ায় পৌঁছে রশিটি বড় একটি পাথরের সঙ্গে বেঁধে সেই রশি ধরেই ফিরে আসেন তিনি। এবার এক এক করে পালাক্রমে রশি বেয়ে সম্মুখের চড়ায় চলে আসতে শুরু করেন সবাই। এভাবে স্রোত অতিক্রম করা সন্তান-সম্ভাবনা ফাতেমার জন্য ছিল বেশ কষ্টকর। অবশেষে ইমামের পরামর্শে ফাতেমা রশির অপর মাথা কষে দেহের সঙ্গে বেঁধে নেন এবং পানিতে নেমে পড়েন। অপরদিক থেকে দ্রুতগতিতে রশি টেনে ফাতেমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে একে একে প্রত্যেকে সম্মুখের চড়ায় পৌঁছে যান।

এ চড়ায় আত্মগোপন করার মত জায়গা নেই। সামনের নদীর স্রোত-ও তেমন তীব্র নয়। তাই ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে কেটে সম্মুখে অগ্রসর হতে শুরু করেন তারা। প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করে তারা নদীর কুলে আসার চেষ্টা করেন। ঠিক এ সময়ে কি একটি জলজ প্রাণী ঠোকর মারে ফাতেমার ঘাড়ে। ভয়ে ফাতেমার মুখ থেকে চীৎকার বেরিয়ে আসে। মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে কুলে অবস্থানরত রুশ সৈন্যরা অন্ধকারে ফায়ার করতে শুরু করে। ফাতেমাকে সামলে নিয়ে ইমাম কুলের প্রায় নিকটে চলে আসেন। ফাতেমাকে নদীর কুলে একটি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে ইমাম ধীরে ধীরে উপরে উঠে যান। অতক্ষণে রুশ সৈন্যদের এলোপাতাড়ি গুলিতে সাহেদা বেগম, শিশু সাঈদ এবং দু'জন নায়েব শহীদ হয়ে যান। গাজী মুহাম্মদের পায়েও একটি গুলি বিদ্ধ হয়।

উপরে উঠেই ইমাম খঞ্জর হাতে নেন। আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েন রুশ বাহিনীর উপর। চোখের পলকে তাঁর খঞ্জরের আঘাতে ৯ রুশ সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দশম জন আত্মসংবরণ করে ইমামকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। গুলিটি ইমামের ডান বাহুতে এসে বিদ্ধ হয়। কিন্তু আরেকটি গুলি ছোড়ার সুযোগ দেননি তাকে ইমাম। উল্টো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের খঞ্জর আমূল বসিয়ে দেন তার পেটে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় সে।

অন্য সিপাহীরা এদিকে মনোযোগী হওয়ার আগেই ইমাম শামিল ফাতেমা, আহত গাজী মুহাম্মদ এবং জীবনে রক্ষা পাওয়া চার নায়েবকে নিয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে যান। রুশ সৈন্যরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে।

সঙ্গীদের নিয়ে অতি সন্তর্পণে ইমাম শামিল গমরী গিয়ে পৌঁছেন। ইমামের স্ত্রী ফাতেমার ক্লান্ত দেহ এখন অসাড়। মুখমণ্ডল তার ফ্যাকাশে, দু' চক্ষু কোঠরাগাত। ব্যাথায় চীৎকার করছে শিশু গাজী মুহাম্মদ। দু'দিনের না খাওয়া তারা সকলে। সঙ্গীদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার কথা বলে ইমাম নিজেও একটি পাথরের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে যান। মুহূর্ত মধ্যে রাজ্যের ঘুম নেমে আসে তার ক্লান্ত চোখে।

পরদিন ভোর বেলা। পূর্বাকাশে সূর্য উকি-ঝুঁকি মারছে। কারো পায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যায় ইমামের। হঠাৎ চমকিত হয়ে উঠে বসেন তিনি। গঞ্জর হাতে নেন।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক আগন্তুক। ইমাম তাকে দেখেননি কখনো। একেবারেই অপরিচিত লোকটি। হাতে তার একটি পুটুলী।

অকস্মাৎ ইমামের এক নায়েব আগন্তুকের পিছনে এসে দাঁড়ান। আগন্তুক ইমামকে উদ্দেশ করে বলে, আপনি বোধ হয় আমাকে জানেন না। আমি কিন্তু আপনাকে জানি। আমি মোল্লা মুহাম্মদের পুত্র মোল্লা আহমদ। আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আর আমি আমার কৈফিয়ত পেশ করার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

'কৈফিয়ত?' ইমামের কণ্ঠে বিস্ময়।

জি হ্যাঁ, কৈফিয়ত! আগে আপনি কিছু খেয়ে নিন। বিস্তারিত কথা পরে হবে। বলেই মোল্লা আহমদ পুটুলিটি ইমামের সামনে রেখে দেন। নায়েব পুটুলিটি খুলে দেখেন, ভুনা গোশ্‌ত আর রুটি। গোশ্‌ত-রুটির একটি টুকরা মুখে দিয়ে দেখেন নায়েব। অতঃপর ইমামকে বলেন, 'অসুধি নেই খেতে পারেন'।

'আপনি বসুন, সব ঘটনা খুলে বলুন।' মোল্লা আহমদকে উদ্দেশ করে বললেন ইমাম।

ইমাম শামিল ও তাঁর নায়েব আহার করছেন আর মোল্লা আহমদ ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন, 'আমার জান্নাতবাসী পিতার পক্ষ থেকে আপনাকে যে পয়গাম দেয়া হয়েছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ বানোয়াট, মিথ্যা।'

থমকে যান ইমাম। হাতের রুটি তাঁর ছুটে পড়ে যায় নীচে। মুখে দেয়া রুটি চিবুতে ভুলে যান। অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন মোল্লা আহমদের মুখের দিকে। কিছুটা আত্মস্থ হয়ে কাঁপা কণ্ঠে বলেন, 'জান্নাতবাসী?'

'জি হ্যাঁ, আব্বাজান শাহাদতবরণ করেছেন। একবার কয়েকজন গাদ্দার অজ্ঞান করে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় রুশ ফৌজের ক্যাম্পে। কঠোর নির্যাতনের মুখে শহীদ করা হয় তাঁকে। তাঁর আংটি ও তসবীহসহ এক গাদ্দারকে পাঠানো হয় আপনার কাছে। আমি ঘটনা জানতে পারি দু'দিন পর। এক রুশ গুপ্তচর ঘটনাটি আমাকে জানায়। লোকটি ছিল আব্বাজারে শিষ্য। তাই আব্বাজানের এই করুণ মৃত্যুতে সেও মর্মাহত হয় এবং সব ঘটনা আমাকে খুলে বলে।' বললেন, মোল্লা আহমদ।

'তা এখানে আপনি আসলেন কী করে?' জিজ্ঞাসা করেন ইমাম।

'আপনাকে রুশদের প্রতারণার সংবাদ জানানোর জন্য বেশ ক'দিন ধরেই আমি এখানে আসবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তাদের প্রহরা ব্যবস্থা এত কঠোর যে, ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। আমার বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্‌ আপনাকে শত্রুর অবরোধ থেকে জীবিত বের করে আনবেন। আমার মন বলছিল যে, আমি অবশ্যই আপনার সাক্ষাৎ পাব। আল্লাহর শোক্‌র, আপনাকে আমি পেয়ে গেছি। এখন দ্রুত আপনি এখান থেকে চলে যান। গমরীর প্রতিটি প্রান্ত চষে ফিরবে রুশ বাহিনী।' বললেন মোল্লা আহমদ।

'আহ্‌! পীর ও মুরশিদ! আল্লাহ্‌ তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করুন। জীবিত থাকতে তিনি আমাকে দিক-নির্দেশনা দিতেন। এখন আমি আপনার পরামর্শ কামনা করি।' বললেন ইমাম।

'অবস্থার পরিবর্তনে আপনজনরাও পর হয়ে যায়। মানুষ এখন দুনিয়া অন্বেষণে ব্যস্ত। চিন্তাধারা বদলে গেছে মানুষের। অচিরেই আপনার মাথার মূল্য ধার্য হয়ে যাবে এবং যে কেউ সেই মূল্য হাতে আনতে চেষ্টা করবে। আমার পরামর্শ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি দাগিস্তান ত্যাগ করুন এবং ফিরে আসার জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতির অপেক্ষা করুন।' বললেন, মোল্লা আহমদ।

২৯ আগস্ট প্রত্যূষে সেনাপতি গ্রেব তার অধীন অফিসারদের বলে, 'কমান্ডার ইন চীপ যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্য এবং শামিলকে জীবিত বা মৃত দেখার জন্য উদ্গ্রীব। কাজেই আজ চূড়ান্ত আক্রমণ চালাও।'

শুরু হয় রুশ বাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণ। কিন্তু কোন প্রতিরোধ নেই কোথাও। ২৮ আগস্ট পাহাড়ে-পাহাড়ে রহস্যময় এক ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল যে, 'কেউ নিজের জীবন নিয়ে পালাতে চাইলে বেরিয়ে যেতে পার।' ঘোষণা শুনে এখনো বেঁচে থাকা মুজাহিদগণ মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে নদীর উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কতিপয় নদী সাঁতরে জীবন নিয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়, আর কতিপয়ের সলিল সমাধি ঘটে।

কোথাও কেউ প্রতিরোধ করছে না, শামিলের কোন পাত্তা নেই, এই সংবাদ শুনে সেনাপতি গ্রেব ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পাগলের মত আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে সে। অবরুদ্ধ মুজাহিদদের সর্বশেষ বাংকার পর্যন্ত পৌঁছে যায় গ্রেব। ঝাঝালো কণ্ঠে আদেশ করে, 'ধ্বংসস্তূপ খুড়ে দেখ, গোপন বাংকার তালাশ কর। প্রতিটি লাশ গভীরভাবে পরীক্ষা কর। ওকে বা ওর লাশ খুঁজে বের কর।'

হাজার হাজার রুশ সৈন্য উখলগুর প্রতিটি প্রান্তে তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালায়। ধ্বংসস্তূপ খুড়ে দেখে। প্রতিটি গুহায় গিয়ে অনুসন্ধান করে। পাথর সরিয়ে সরিয়ে নীচে গোপন পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

সূর্যাস্তের খানিক আগে অধীন অফিসার রিপোর্ট দেয়, কিছু-ই পাওয়া গেল না, স্যার!

শুনে সেনাপতি গ্রেব উত্তেজিত কণ্ঠে অফিসারকে বকতে শুরু করে, 'কিছু-ই পেলি না! লোকটি কি তাহলে আকাশে উড়ে গেল, না মাটিতে ধসে গেল! আমার সব ত্যাগ কি বিফলে গেল! হাজার হাজার রুশ সেনার জীবন কি কোনই কাজেই আসল না! যাও ওকে খুঁজে বের করে আন। আমি শামিলকে চাই-ই চাই। এর অন্যথা আমি শুনতে প্রস্তুত নই। মনে রেখ, যদি শামিল পালিয়ে গেছে প্রমাণিত হয়, তাহলে প্রহরীদের প্রত্যেককে আমি গুলি করে উড়িয়ে দেব।'

রাতভর মশালের আলোতে জীবিত বা মৃত শামিলের অনুসন্ধান অব্যাহত থাকে। পরের দিন ৩০ আগস্টও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপ আর কবর খুড়ে খুড়ে লাশ শনাক্ত করা হয়।

৩১ আগস্ট সেনাপতি গ্রেব অফিসারদের বৈঠক আহ্বান করে। যথাসময়ে অধিবেশন শুরু হয়। গ্রেব বলে, ইমাম শামিল জীবিত বেরিয়ে গেছে না মারা পড়েছে, তা নিশ্চয়তার সাথে বলা যাচ্ছে না। সত্যি সত্যিই যদি সে জীবন নিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে পুনরায় সে অধিক শক্তি সঞ্চয় করে যে আত্মপ্রকাশ করবে, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর সে উত্থান ঠেকাবার শক্তি কারো থাকবে না। অন্ধ বিশ্বাসীরা তার এ জীবন নিয়ে বের হওয়াকে বড় কারামত মনে করবে। তা ছাড়া শামিল পালিয়ে গেছে একথা স্বীকার করে নিয়েও আমরা প্রকাশ্যে তাকে সন্ধান করতে পারব না। তাই আমাদের নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে দাগিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে দাও। তাতে যত ব্যয় যাবে যাক। ওকে গোপনে সন্ধান কর। যদি সে মারা গিয়ে থাকে, তবে তার মৃত্যুর স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ কর।

কয়েকজন সিপাহী ও অফিসার নিয়ে সেনাপতি গ্রেব তমিরখানশুরা পৌঁছে যায়। তিবলিসে কমান্ডার ইনচীপ এর নিকট বিজয়ের সুসংবাদ প্রেরণ করে। কমান্ডার ইন চীপ রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গে শাহেনশাহ নেকুলাইকে সুসংবাদ শোনানোর আয়োজন শুরু করে দেয়। জার-এর আদেশে এক সপ্তাহ পর্যন্ত উৎসব পালন করা হয়। উখলগুতে বীরত্ব প্রদর্শনকারী অফিসার-সিপাহীদের জন্য বিশেষ সংবর্ধনা ও মাল্যের আয়োজন করা হয়। কমান্ডার ইন চীপ তমিরখানশুরা পৌঁছে তার অফিসার ও জওয়ানদের গলায় মাল্য পরিয়ে দেয়। (চলবে)

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

* মরণজয়ী মুজাহিদ ।। মূল্য ঃ একশত টাকা
* মুজাহিদের আযান-১ ।। মূল্য ঃ পঁচাত্তর টাকা
* গজনবীর দেশ থেকে সোমনাথের পথে ।। মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা
* জিহাদ সন্ত্রাস না রহমত ।। মূল্য ঃ চৌদ্দ টাকা
* জিহাদের চল্লিশ হাদীস ।। মূল্য ঃ চৌদ্দ টাকা

আপনার নিকটস্থ লাইব্রেরীতে খোঁজ করুন

জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স

REG NO. DA. 1101 ♦ THE MONTHLY JAGO MUJAHID ♦ APRIL 2000 ♦ PRICE TK.12

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও তিতাস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ, ২৩ যদুনাথ বসাক লেন, (টিপু সুলতান রোড) ঢাকা হতে মুদ্রিত